শ্রীপ্রভাবতী দেবী-সরস্বতী

— অঙ্গরাগ —

কথা—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

নাম—শ্রীব্রজমোহন দাশ

শিল্পী—শ্রীবিজয় রায়চৌধুরী

ব্লক—ন্যাশানাল হাফ্‌টোন কোং

পরিচয়-পত্রাঙ্কন—শ্রীহাসিরাশি দেবী

—পরিকল্পনা—

প্রকাশ ও প্রচার-পন্থা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

স্বত্বাধিকারী—

শ্রীকিরীটিকুমার পাল

তরুণ-সাহিত্য-মন্দির

নববর্ষের শুভ-সন্ধিক্ষণে, বৈশাখী-পূণ্যাহের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সাহিত্য-কুঞ্জে আবির্ভূতা হ'লেন, নব্য-বঙ্গের কল্যাণী-বধূ—'বাংলার বউ।'

বাঙ্গালী যে চায় শিক্ষিতা-সুন্দরী বউ! বাঙ্গালী চায় গৃহকার্য্যে সুনিপুণা সর্ব্বসুলক্ষণা বউ—বাঙ্গালীর চাওয়ার কি আর অন্ত আছে? বউ পাওয়ার আগে বাঙ্গালী চায় আরও অনেক-কিছু। কাঙ্গালী-বাঙ্গালীর মনে কত আশা—কত সাধ!

তাই এলেন এবার 'বাংলার বউ' আজ নূতন রূপে—ঘুমিয়ে-পড়া বাঙ্গালীর গায়ে মর্ম্ম-ছেঁড়া তপ্ত-রক্ত ছিটিয়ে দিতে—এতেও যদি অসাড় বাঙ্গালীর চেতনা আসে। আমরা কেবল পথ দেখিয়ে এঁদের এগিয়ে দিলেম—সাহিত্য-বেতারের ভিতর দিয়ে সারা-বাংলার বাঙ্গালীদের কাছে দারুণ দুঃখের বার্ত্তা শোনাতে।

বিনা-অপরাধে সমাজ-পরিত্যক্তা—অত্যাচারিতা—উৎপীড়িতা—ধর্ষিতা মা-জননীরা—তোমরা আজ মনের কবাট উন্মুক্ত ক'রে বল যা' বলতে এসেছ—লজ্জা কিসের?

বিনীত—

শ্রীকিরীটিকুমার পাল

বাংলার বউ

— উপন্যাস —

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

পোষ্টম্যান আসিয়া কয়েকখানি পত্র দিয়া গেল।

চন্দ্রমোহন বসু তখন তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, সম্মুখের পত্র-কয়েকখানা একবার নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন মাত্র।

একখানা বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, আর-একখানি গুরুদেব কাশী হইতে দিয়াছেন—তিনি শীঘ্রই আসিতেছেন। তৃতীয় পত্রখানি আসিতেছে নদীয়া জেলার মেহেরপুর গ্রাম হইতে, লিখিয়াছেন জনৈক আত্মীয়া, চতুর্থ পত্রখানি আসিতেছে রুদ্রপুরের পোষ্ট-অফিসের ছাপ বহন করিয়া।

এই পত্রখানাই মনোযোগ আকর্ষণ করিল বেশী, তাই চন্দ্রমোহন আগেই এই পত্রখানা তুলিয়া লইলেন।

কভার ছিঁড়িয়া পলকের দৃষ্টি পত্রের উপর বুলাইয়া লইলেন মাত্র।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘৃণায় তাঁহার সারা মুখখানা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, হাতের পত্রখানা সামনে ফেলিয়া তিনি আবার তামাক টানিতে লাগিলেন।

পত্রখানা না-খুলিলেই ভালো হইত ; এরূপ পত্র আসা এই নূতন নয়, ইহার পূর্ব্বেও কয়েকখানা আসিয়াছিল, সে-সবই ফেরত গিয়াছে।

অনেকক্ষণ তামাক টানিতে-টানিতে মনে হইল কলিকায় আগুন নাই, তামাকও অনেকক্ষণ পুড়িয়া গিয়াছে।

সোজাভাবে বসিতে গিয়া আবার দৃষ্টি পড়িল পত্রখানার উপর, তিনি আবার সেখানা কুড়াইয়া লইলেন।

গতকল্যকার তারিখ দেওয়া, রুদ্রপুর হইতেই আসিতেছে বটে। লিখিয়াছেন রঞ্জনের মাতা, চন্দ্রমোহনের বৈবাহিকা।

সেই একঘেয়ে কথা—অম্বুলাকে লইয়া যাইবার জন্য আবেদন।

কিন্তু আর তাহা হয় না, হইবার নয়।

অম্বুলার সহিত রঞ্জনের বিবাহের বেশ একটি ইতিহাস আছে।

যাহা হইবার নয় অনেক সময় তাহাও হইয়া যায়। লোকে কথায় বলে—বিধাতার মার দুনিয়ার বার, কথাটা যথার্থ, এবং এই পরম সত্য অম্বুলার বিবাহে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

অতুল বিত্তশালী চন্দ্রমোহন বসুর আদরিণী কন্যা অম্বুলা, বিবাহ হইয়াছে দূর-পল্লীগ্রামে দরিদ্র রঞ্জনের সহিত।

চন্দ্রমোহনের বিধবা ভগিনীই এই বিবাহের প্রধান হেতু। তাঁহার শ্বশুরালয় রুদ্রপুর গ্রামে এবং তিনিই বালিকা অম্বুলাকে একবার আট-দশদিনের জন্য নিজের কাছে লইয়া যান।

চন্দ্রমোহন আপত্তি করেন নাই; বিধবা ভগিনী তাঁহার নিকটেই থাকিতেন, বৎসরে একবার করিয়া আট-দশদিনের জন্য রুদ্রপুরে গিয়া জমির খাজনাপত্র আদায় করিতেন। অম্বুলা পূর্ব্বেও কয়েকবার তাঁহার সহিত রুদ্রপুরে গিয়াছিল। শেষবারে তিনি যে অষ্টমবর্ষীয়া অম্বুলার বিবাহ-পর্ব্বটা সেখানেই শেষ করিয়া ফেলিবেন, চন্দ্রমোহন তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

রঞ্জনের বয়স তখন পনেরো বৎসর মাত্র,—অবস্থাও যে ভালো তাহাও নহে। সামান্য কয়েক-বিঘা জমি আছে, তাহাতেই কোনরকমে দিন কাটিয়া যায়।

অরুন্ধতীর সহিত রঞ্জনের মায়ের কোন্‌কালে কি কথা হইয়াছিল কে জানে, সেই কথা রক্ষা হইয়াছিল এই বিবাহ দ্বারা।

এ-সংবাদ যখন চন্দ্রমোহনের নিকট কলিকাতায় পৌঁছাইল, তখনকার তাঁহার অবস্থা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

ঘণ্টাখানেক সমস্ত বাড়ীময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়া, চাকরকে মারিয়া, সকলকে তিরস্কার করিয়া তিনি অবশেষে নিজেই শান্ত হইলেন।

বন্ধু অমরেশ সান্ত্বনা দিলেন—যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার উপরে আর হাত দেওয়া চলিবে না। হিন্দুর বিবাহ, এ-আর ফিরিবার যো নাই।

চন্দ্রমোহন তথাপিও জোর করিয়া বলিতে চাহিলেন, তিনি এ-বিবাহ অসিদ্ধ প্রমাণ করিবেন।

অমরেশ জানাইলেন, তাহা কিছুতেই হইবার যো নাই—চন্দ্রমোহন নিজে আইনজীবী, হিন্দু-আইন আর-একবার নাড়া-চাডা করিয়া দেখুন।

আইনজীবী চন্দ্রমোহন নীরব হইয়া রহিলেন।

ইহার পর তাঁহার কড়া-পত্রের তাগিদে অমূলা আসিয়া পৌঁছাইল, অরুন্ধতী আর আসিলেন না।

চন্দ্রমোহন জামাতার কোন খোঁজ লইলেন না, বিবাহ সম্বন্ধে কন্যাকে একটি প্রশ্নও করিলেন না, যেন কিছুই হয় নাই এমনইভাবে কন্যাকে গ্রহণ করিলেন।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল।

চন্দ্রমোহনের স্ত্রী ছিলেন না—অমুলা পিসীমার নিকটে মানুষ হইয়াছিল। দুই ভাই থাকিলেও তাহারা এ-সব সম্বন্ধে কোন খোঁজ রাখে নাই।

বৃদ্ধা দাসী শ্যামা একদিন অমুলাকে সিঁদুর পরাইয়া দিয়াছিল, সেদিন চন্দ্রমোহনবাবু তাহাকে ধরিয়া মারেন আর কি! তাহার পর হইতে অমুলার সিঁথায় আর কেহ কোনদিন সিঁদুর দেখিতে পায় নাই।

অমুলা যেমন স্কুলে যাইত তেমনই যাইতে লাগিল। ক্রমে সে ম্যাট্রিক এবং আই-এ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইল—বর্ত্তমানে সে ফোর্থ-ইয়ারে পড়িতেছে।

কোনদিন যে বিবাহ হইয়াছিল, সেদিনের কথা আজও তাহার মনে না-থাকিলেও ঝাপ্‌সা একটা স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে। অমুলা অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য।

চন্দ্রমোহনের নিকটে আজ দশ বৎসরের মধ্যে অন্ততপক্ষে দশ-বারোখানি পত্র আসিয়াছে, কিন্তু কোন পত্রই তিনি গ্রহণ করেন নাই, সব পত্র ফেরত দিয়াছেন।

কেবলমাত্র এই পত্রখানাই তাঁহার হাতে খোলা অবস্থায় পড়িল, তিনি পত্রখানা ছিঁড়িয়া জানালা-পথে বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। এ-পত্র অমুলার হাতে পড়ে বা সে রুদ্রপুরের সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারে তাহা তিনি চাহেন না।

তিনি জানেন, অমুলা সে-সব কথা ভুলিয়া গিয়াছে। আট বৎসর বয়সে একটা রাত্রে কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, আজ দশ-এগারো বৎসর পরে সে-কথা মনে রাখা সম্ভব নয়।

*
* *

ব্যাডমিণ্টন খেলিবার জন্য ব্যাট লইয়া বাগানে নামিতেই অমলার দৃষ্টি পড়িল জানালার নীচে ছেঁড়া-কাগজের টুক্‌রাগুলির উপর।

পাশ দিয়া যাইতে একটা ছোট টুক্‌রায় একটি নাম মাত্র দেখা গেল··· ······বউমাকে রঞ্জন—

ঔৎসুক্য জাগিয়া উঠিয়াছিল। অমলা একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল, তাহার দাদা নিরুপম অদূরে নেট টাঙ্গাইবার জন্য ব্যস্ত, এদিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ তাহার নাই। অমলা চট্‌ করিয়া নীচু হইয়া কাগজের টুক্‌রাগুলি কুড়াইয়া লইয়া ওভার-কোটের পকেটে রাখিল।

সেদিন খেলায় সে মোটেই মন দিতে পারিল না। বউদি হাসিমুখে বলিল, "অমলার মনটা আজ কোথায় প'ড়ে আছে আমি গুণে ঠিক ব'লে দিতে পারি।"

নিরুপম বিরক্ত হইয়া বলিল, "আজ তোর হয়েছে কি বল দেখি অমু, খেলায় মোটে মন দিতে পারছিস নে?"

নিরুপমের বন্ধু বিনিময় একটু হাসিয়া বলিল, "এর জন্যে ওঁকে বলা মিথ্যে, মানুষের মেজাজ সবদিন সমান থাকে না সে জানা কথা।"

খেলা সেদিন জমিল না, নিতান্ত অসময়েই খেলা বন্ধ করিয়া দিতে হইল।

সকলে আসিয়া ঘরে বসিল—চা আসিল।

অমূলা আজ কিছুতেই আন্তরিকভাবে যোগ দিতে পারিল না। দাদা গান গাহিতে বলিলেন, অমূলা আজ গান গাহিতেও পারিল না।

পকেটে পত্রের টুক্‌রা-কয়টি রহিয়াছে, এই-কয়টি কোনরকমে জোড়া দিয়া পড়িতেই হইবে, ঔৎসুক্য সে দমন করিতে পারিতেছিল না।

পড়ার অছিলা করিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

নিজের ঘরে আসিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া সে টেবলের ধারে চেয়ারে বসিয়া পকেট হইতে ছেঁড়া টুক্‌রা-কয়টি বাহির করিয়া সাজাইতে লাগিল।

মিনিট-পনেরোর চেষ্টায় পত্রের টুক্‌রাগুলি ঠিকমত সাজানো গেল। অমূলা পড়িল—

রুদ্রপুর—

২রা আষাঢ়,

আপনাকে অনেক পত্র দিয়াও কোন উত্তর পাই নাই, তাই পুনরায় লিখিতেছি। আপনি বউমাকে এখানে পাঠাইবেন না জানি, তথাপি আবার লিখিতেছি। যখন রঞ্জনের বিবাহ হইয়াছিল তখন সে পনেরো বৎসরের এবং বউমা আট বৎসরের মাত্র। তারপর দশ-এগারো বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, আপনি আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নাই—বউমাকে জানিতেও দেন নাই যে তাহার বিবাহ হইয়াছে। আপনি কি এ-বিবাহ স্বীকার করিবেন না? আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ, বউমাকে একবার দেখিতে চাহিতেছি। যদি দয়া করিয়া একটি দিনের জন্যও পাঠান, সেইজন্যই আমি রঞ্জনকে দুই-একদিনের মধ্যে আপনার

ওখানে পাঠাইব। আমি একবার মাত্র বউমাকে দেখিব, দয়া করিয়া আপত্তি করিবেন না।

আপনার বেহাইন।

অম্বুলা নিস্তব্ধে বসিয়া রহিল। আজ স্বপ্নের মত মনে পড়িতেছে সেই একটা রাত্রির কথা। কবে মনে নাই—সেদিন কতদিন আগে আসিয়াছিল তাহাও ঠিক স্মরণ হয় না। শুধু মনে পড়ে—সম্মুখে আসনে বসিয়াছিল একটি ছেলে, দৃপ্ত তাহার মুখ, দীর্ঘ উন্নত দেহ। সে সুন্দর কি কালো আজ মনে পড়ে না, মনে পড়ে মাত্র তাহার সেই উজ্জ্বল দুইটি চোখের দৃষ্টি।

তাহার হাতের উপর ছিল অম্বুলার হাত, পুরোহিত মন্ত্র পড়িতেছিলেন—কি সে মন্ত্র তাহা মনে পড়ে না।

সেই বালক—সে আজ হইয়াছে যুবক, তাহার দেহে অসীম শক্তি, মনে অসীম সাহস, সে সিংহের সহিত লড়াই করিতে পারে, বন্য-হস্তীর শুঁড় চাপিয়া ধরিতে পারে।

সে আজ কোথায়?

কোথায় সে রুদ্রপুর কে জানে? আজ সে-গ্রামের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে না, শুধু মনে পড়ে ছায়ায় ঢাকা পুষ্করিণীর কথা। সেই ঘাটে সে দাঁড়াইয়াছিল, কে আসিয়া পিছন হইতে তাহার চোখ চাপিয়া ধরিয়াছিল, চম্‌কাইয়া পিছন ফিরিয়া সে চাহিয়া দেখিয়াছিল, রঞ্জন দাঁড়াইয়া হাসিতেছে—সেই রঞ্জন, যাহার হাতের উপর তাহার হাত ছিল।

অম্বুলা তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল।

দরজা ঠেলিয়া কে বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি ঘরে আসতে পারি?"

অমুলা ক্ষিপ্রহস্তে কাগজের টুক্‌রাগুলা কুড়াইয়া পকেটে ফেলিয়া একখানা বই টানিয়া লইল।

দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল, বিনিময়।

অতি আধুনিক ছেলে সে, সম্প্রতি কোনও আত্মীয়ের অর্থে বিলাতে গিয়া পড়ার পরিবর্ত্তে কেবল বেড়াইয়া আসিয়াছে।

অমুলার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মনোরম ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিতে আজও বিলাতে রহিয়াছে। সে যে মেম বিবাহ করিয়াছে সে-সংবাদ বিনিময়ই বহন করিয়া আনিয়াছে।

বিনিময় প্রবেশ করিতেই অমুলা উঠিয়া দাঁড়াইল—"আপনার কোন দরকার আছে বিনিময়বাবু?"

বিনিময় উত্তর দিল, "মা একটা কথা বলবার জন্যে বলেছিলেন, এতক্ষণ সেটা বলা হয় নি। কাল আমাদের বাড়ীতে তোমাদের একবার যেতে হবে, আমার বোনের আশীর্ব্বাদ হবে।"

অমুলা বলিল, "বউদিকে ব'লে গেলেই হ'তো, এর জন্যে আবার আপনাকে আসতে হ'লো। আচ্ছা আসুন, বউদি যদি যান আমি যাব।"

বিনিময় আরও কি বলিবার জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু অমুলার ভাব দেখিয়া আর কোন কথা বলিবার সাহস হইল না—আস্তে-আস্তে বাহির হইয়া গেল।

একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি ধরাইয়া অমুলা পত্রের টুক্‌রাগুলিতে আগুন ধরাইয়া দিল।

কাগজ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, কিন্তু পত্রের প্রতি কথাটি অমুলার মনে দৃপ্তভাবে জ্বলিতে লাগিল।

দরিদ্র হওয়া মস্ত বড় অপরাধ সে জানা কথা। সংসারে তাই প্রতি পদে দরিদ্রের ঘটে পরাজয়, ধনী লাভ করে জয়। ধনীর প্রাসাদের পার্শ্বে দরিদ্রের পর্ণকুটীর ধনীর চোখে সহ্য হয় না তাই যে-কোনরকমেই হোক পর্ণকুটীরের অস্তিত্ব লোপ হয়।

অমুলা নিঃশ্বাস ফেলে।

পড়া মোটেই হয় না, দুই করতলে মাথা রাখিয়া অমুলা ভাবে দশ-এগারো বৎসর পূর্ব্বের একটি ছবি।

*

* *

অমুলার ঘরের পাশেই আর-একখানি বাড়ী, পাশাপাশি ঘরের ব্যবধান মাত্র দেড় কি দুই হাত।

অনেককাল এ-ঘরখানি বন্ধ ছিল—হঠাৎ একদিন দেখা গেল, জানালা খোলা।

কলেজ হইতে ফিরিয়া সেদিন অমুলা দেখিল, ঘরের ভিতরটা সুন্দর ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে। বাসনপত্র, বিছানা, বাক্স সবই বেশ পরিপাটীরূপে গুছানো—একধারে একটি আলনায় খান-দুই-তিন লালপাড় শাড়িও দেখা গেল। বেশ বুঝা গেল—গৃহের কর্ত্রী একটি সধবা মেয়ে, যদিও তাহাকে তখনও দেখা যায় নাই।

মুহূর্ত্তের ঘর দেখা এবং অধিবাসিনী সম্বন্ধে জানার ঔৎসুক্য মুহূর্ত্তেই দূর হইয়া গেল।

দিনের পর দিন যায়, পাশের ঘর হইতে বাসনপত্রের ঝন্‌ঝনানি শব্দ কাণে আসে, একটি মেয়ের চাপা-কথা শোনা যায়, অম্লার ঔৎসুক্য ওইখানেই মিটিয়া যায়। আজকাল বরং পড়ার বিঘ্ন হয় বলিয়া সে পূর্ব্বের জানালাটি বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

আষাঢ় কবে চলিয়া গেল, শ্রাবণের ধারা অবিশ্রাম অঝোরে ঝরিতে লাগিল, আকাশ দিবারাত্রি মেঘাচ্ছন্ন রহিল।

সেদিন সন্ধ্যায় বন্ধু সুদেষ্ণা আসিয়া গান গাহিয়াছিল—

"আজি এ শ্রাবণ নিশা কাটে কেমনে—"

রহিয়া-রহিয়া শুধু গানের সেই লাইনটাই মনে পড়ে, 'আজি এ শ্রাবণ নিশা কাটে কেমনে'—অম্লা অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে, বইয়ের পাতা সামনে খোলা পড়িয়া থাকে।

সেদিন কলেজে না-যাইয়া অম্লা বাড়ীতেই ছিল।

কি মনে করিয়া সে পাশের জানালাটা খুলিয়া ফেলিল।

পাশের ঘরে স্বামী খাইতে বসিয়াছে, স্ত্রী খাওয়াইতেছে। বাহিরে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া ঝরিতেছে শ্রাবণের ধারা—পথ জলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কার্য্যান্তে স্বামী এখনই ফিরিয়া আসিয়াছে, হয়ত আহারান্তে আবার কার্য্যে যাইবে।

আরও একদিন অম্লা জানালা খুলিয়া একটুখানির জন্য উঁকি দিয়াছিল। সেদিনে দেখিয়াছিল, বউটি একাই রাঁধিতেছে, স্বামী কার্য্যে গিয়াছে।

আর-একদিন জানালা খুলিতেই স্বামী স্ত্রী দুইজনের চক্ষুই জানালার উপর পড়িল, মেয়েটি তাড়াতাড়ি আসিয়া নিজেদের জানালার পর্দা সরাইয়া দিল।

অবশেষে অম্বুলা নিজেই পরিচয় করিয়া লইল।

মেয়েটি আস্তে-আস্তে সরিয়া যাইতেছিল, অম্বুলা তাহাকে ডাকিল—সে দাঁড়াইল। সাধারণ একটি মেয়ে, লেখাপড়া জানে না তাই কথা বলিতে ভয় পায়।

অম্বুলা একটু হাসিয়া বলিল, "না না, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সামান্য একটু লেখাপড়া শিখেছি, তাতে আর কি? তুমিও যা, আমিও তাই, দুজনেই তো আমরা মানুষ, তফাৎ আমাদের কোথায়?"

মেয়েটি ভারি খুসি হইয়া উঠিল।

কথায়-কথায় জানা গেল—তাহাদের বাড়ী তারকেশ্বরের কাছে কোন একটা গ্রামে। এতদিন অনেক কষ্ট পাইয়াও তাহারা গ্রাম ছাড়ে নাই, কিন্তু এবারে দারুণ অজম্মা হওয়ায় আহার্য্যাভাবে তাহারা স্বামী স্ত্রী বাহির হইয়া আসিয়াছে। স্বামী একটা দোকানে কুড়ি টাকা বেতনে কাজ করে, ঘরের ভাড়া ছয় টাকা দিয়া বাকি টাকায় তাহাদের দিন বেশ কাটিয়া যায়।

প্রথম আলাপেই অম্বুলা বলিয়া বসিল, সে একদিন বউটির বাড়ী বেড়াইতে যাইবে।

মেয়েটিকে বেশ লাগিল এবং ভালো লাগিল বলিয়াই বউদিকে সে তাহার কথা বলিল।

বউদি গালে হাত দিয়া বলিল, "ছি-ছি, শেষে এমনি ক'রে যার-তার সঙ্গে আলাপ করতে বসলে অম্বুলা—ওতে নিজের প্রেষ্টিজ নষ্ট হয় তা জানো?"

বিরক্ত হইয়া অমলা বলিল, "ফাঁকা প্রেষ্টিজ তোমাদেরই থাক্ বউদি, যা' আমার ভালো লাগে না আমি তা' নিয়ে চলতে পারি নে। আমি বুঝতে পারি নে—ওদের সঙ্গে আলাপ করলে প্রেষ্টিজ নষ্ট হবে কি ক'রে?"

মায়া বলিল, "আলাপ করলে যে নষ্ট হয় আমি তা' বলতে চাই নে, তবে ওদের বাসায় যাওয়াটা আমি অন্যায় ব'লে মনে করি।"

অমলা না-গেলেও পরদিন সেই মেয়েটি নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইল।

অতি সরল প্রকৃতি গ্রাম্য-মেয়ে, সহরের আবহাওয়ায় আজও তাহার প্রকৃতি নষ্ট হইতে পারে নাই। সামান্য এককথায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কোন কথা গোপন রাখিতে পারে না, যাহা মনে আসে নিঃসঙ্কোচে তাহাই বলিয়া যায়।

সেদিন রাত্রে আহার করিতে বসিয়া অমলা বলিল, "আমার কিন্তু সহরের চেয়ে গ্রামটাকেই বেশী ভালো লাগে বউদি।"

মায়া দুইটি চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন গ্রামটাকে—রুদ্রপুরকে?"

অমলার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, তখনি সে-ভাব সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "রুদ্রপুর গ্রাম কবে দেখেছি তা' মনে নেই। বাংলার যে-কোন গ্রামকেই আমার ভালো লাগে আমি সেই কথাই বলতে চাচ্ছি।"

মায়া একটু হাসিল মাত্র।

সে যে কি উদ্দেশ্য লইয়া হাসিল তাহা বুঝিতে অমলার বিলম্ব হইল না। সে বলিল, "বাস্তবিক তা নয় বউদি, তুমি যা ভাবছো

সে মিছে কথা। সেদিন আমরা আমাদের প্রিন্সিপালের সঙ্গে চন্দন-নগর গিয়েছিলেম,—তার আশপাশের গ্রামগুলো দেখে সত্যি বড় সুন্দর লেগেছিল।"

মায়া গম্ভীর হইয়া বলিল, "গ্রাম প্রথমটায় দেখতে যত ভালো লাগে, থাকতে গেলে আর তত ভালো লাগে না। সহরের সৌন্দর্য্য নিত্য নূতন, কিন্তু গ্রামের সৌন্দর্য্য একঘেয়ে হ'য়ে পড়ে, কিছুদিন পরে বৈচিত্র্য আর কিছুমাত্র থাকে না।"

অম্লা বলিল, "কিন্তু আমার মনে হয়, গ্রামে থাকতে পেলে আমি আর কিছুই চাই নে, চিরকাল আমি গ্রামে কাটাতে পারব। জানো বউদি, এ-রকম সহরের জীবন বড় একঘেয়ে হ'য়ে গেছে, গ্রামে মেয়েরা কেমন জল তোলে, বাসন মাজে, ঘর নিকোয় ;—"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, আমি বাবাকে একথা বলব'খন।"

অম্লা বলিল, "বাবাকে একথা বলবে—মানে ?"

মায়া বলিল, "যাতে তোমাকে খুব শিগ্‌গীরই রুদ্রপুর পাঠান, তার ব্যবস্থা করতে বলব।"

অম্লা হাসিল, বলিল, "আমি গেলে তবে তো পাঠাবে! তোমাকে কে বললে আমি রুদ্রপুর যেতে চাচ্ছি ?"

মায়া বলিল, "কাউকে বলতে হয় নি, আমি নিজেই বুঝছি।"

অম্লার আহার শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "পাগলামী ক'রো না বউদি, বাবাকে কোন কথা বলতে যেয়ো না। এ-সব কথা বাবা শুনলে কি ভাববেন ঠিক নেই—হয়ত সত্যি বলেই জেনে নেবেন—ছিঃ!"

মায়া হাত ধুইতে-ধুইতে বলিল, "বলি যদি তোমার দাদাকে বলব, বাবাকে বলতে যাব না। আমি তো এখনও পাগল হই নি—"

বলিতে-বলিতে সে হাসিয়া উঠিল।

*

* *

কলেজের বার্ষিক উৎসবের দিন—অমলার আজ ফিরিতে অনেক দেরি হইবে সে বলিয়া গিয়াছে।

চন্দ্রমোহনের শরীরটা তত ভালো ছিল না,—সম্প্রতি বাতে আক্রান্ত হইয়া বড় কষ্ট পাইতেছিলেন।

মায়া তাঁহার পায়ে বাতের তৈল মালিস করিতেছিল। কাজটা চন্দ্রমোহনের ভৃত্য মণিলালেরই করার কথা, সে আজ অনুপস্থিত। মায়া অন্য ভৃত্যকে করিতে দেয় নাই, নিজেই মালিস করিতে বসিয়াছে।

পুত্রবধূকে দিয়া মালিস করাইতে চন্দ্রমোহন বিলক্ষণ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু মায়া ছাড়িল না।

বলিল, "অসুখ শরীর নিয়ে লজ্জা করার কোন মানে নেই বাবা, আপনি যদি ভালো থাকতেন, আমার আসার কোন দরকার হ'তো না।"

জোর করিয়া সে হাঁটুতে তৈল মালিস করিতে লাগিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রমোহন বলিলেন, "অসুখ-বিসুখ হ'লে আমার কেবল অরুন্ধতীর কথাই মনে পড়ে বউমা। ছোটবেলা হ'তে

দাদা বলতে অজ্ঞান, আমার কিছু হ'লে তার আহার নিদ্রা থাকতো না। একবার আমার সামান্য একটু জ্বর হয়েছিল, সে খবর কি ক'রে যে সেই রুদ্রপুরে পৌঁচেছিল কে জানে, হঠাৎ দেখি রাত বারোটার ট্রেনে সে এসে উপস্থিত, কি—না আমার জ্বরের কথা শুনেছে। তোমায় বলব কি বউমা, আমায় এমনি ক'রে আদর দিয়ে-দিয়ে সেই আমায় ননীর পুতুল করেছে। তোমার শ্বাশুড়ী এজন্যে তাকে যে কত বকতেন—"

মায়া চুপ করিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া চন্দ্রমোহন বলিলেন, "আজ সে থাকলে আমায় কারও হাতের সেবা নিতে দিতো না, নিজেই সব করতো। আজ তাই ভাবি—"

মায়া মুখ তুলিয়া বলিল, "তিনি কোথায় আছেন বাবা ?"

মায়ার বিবাহ হইয়াছে মাত্র আজ তিন বৎসর, দশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা সে গল্পরূপে দাসীদের মুখে শুনিয়াছে।

চন্দ্রমোহন বলিলেন, "রুদ্রপুরে ছিল জানতেম, এখন কোথায় আছে জানি নে। সে তো আমায় আর পত্র দেবে না, নইলে সেই সব জানাতো।"

সব জানিয়াও মায়া অজ্ঞের মত প্রশ্ন করিল, "কেন তিনি আপনাকে পত্র দেবেন না বাবা ?"

চন্দ্রমোহন একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে অনেক কথা বউমা, তবে আমিই তাকে বারণ ক'রে দিয়েছি, যেন সে আমাকে আর কোন পত্র না-দেয়। আমার কথা সে মেনে চলেছে, আজ দশ বছর সে আমায় পত্র দেয় নি—উঃ !"

হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেই মায়া মালিস করিতে থামিয়া গেল—"লেগেছে বাবা?"

চন্দ্রমোহন উত্তর দিলেন, "একটু লেগেছে। থাক্, ওতে কিছু আসে যায় না, অমন কত লাগে। তুমি যতটা নরম ক'রে মালিস করছো মা, হতভাগা মণিলাল কি তেমন ক'রে করে? এতক্ষণ এমন ক'রে ডলতো যাতে ক'রে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করতে হ'তো।"

মায়া নিঃশব্দে মালিস করিতে লাগিল।

"আচ্ছা বাবা, অমূলার বিয়ে রুদ্রপুরেই হয়েছিল না?"

চন্দ্রমোহন যেন চমকাইয়া উঠিলেন—"কে বললে? নিরু বুঝি?"

মায়া বলিল, "না, তিনি কোন কথাই বলেন নি, লোকের কাছে শুনেছি।"

চন্দ্রমোহন উঠিয়াছিলেন, ধীরে-ধীরে শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, "সে বিয়েকে হিন্দু-আইন বিয়ে বলে মানলেও আমি বিয়ে বলে মানব না। অরুন্ধতী যে আমার কি সর্ব্বনাশ করেছে বউমা, তা' তোমায় ব'লে বোঝাতে পারি নে। আজ অমূলার দিকে চাইলে আমার বুক জ্বলে ওঠে, সঙ্গে-সঙ্গে অরুন্ধতীর কথা মনে হয়, আর তার মুখ দেখার প্রবৃত্তি আমার হয় না।"

অনেকক্ষণ তিনি চোখের উপর হাতখানা আড়াআড়ি রাখিয়া নিস্তব্ধে শুইয়া পড়িয়া রহিলেন।

মায়া শান্তকণ্ঠে বলিল, "আপনি বিয়ে বলে না মানলেও এটা সত্যি কথা যে বিয়ে হয়েছে, অমূলাকেও তা' তো মানতে হবে বাবা!"

চোখের হাত নামাইয়া চন্দ্রমোহন বলিলেন, "আট বছর বয়েসে কি হয়েছে না-হয়েছে তার তাই মনে নেই, সে কি মানবে?"

মায়া বলিল, "আমার মতে রঞ্জনকে একবার এখানে ডাকা দরকার।"

চন্দ্রমোহন ক্ষণকাল তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঞ্জনকে তুমি চেনো বউমা?"

মায়া উত্তর দিল, "না, তার নাম শুনেছি।"

চন্দ্রমোহন বলিলেন, "হয়ত তাকে আমি জামাই ব'লে মেনে নিতেম, কিন্তু তা' পারলেম না বউমা, কারণ সে একটা অশিক্ষিত গ্রাম্য-যুবক মাত্র। অমলা ফোর্থ-ইয়ারে পড়ে আর তার স্বামী মূর্খ, এ-গ্লানি সে রাখবে কোথায়? আমি জানি, অমলা তার স্বামীকে কখনই কোনদিন মেনে নিতে পারবে না, কাজেই রঞ্জনকে এখানে না-ডাকাই ভালো।"

মায়া ধীরকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু অমলা ইচ্ছা করলেই তো ওই স্বামীকে মানিয়ে নিতে পারে। শুনেছি, পুরাণে এ-রকম অনেক মেয়ের কাহিনী আছে।"

চন্দ্রমোহন একটু হাসিয়া বলিলেন, "পুরাণের সে-সব কথা এখন তোলা থাক্ বউমা। উপদেশ দেওয়ার বেলা অনেক কিছুই বলা চলে, কিন্তু সে-সব মেনে চলাই না মুস্কিল! অমলা বি-এ পড়ছে, আজ যদি তাকে বলি তুমি বেদবতীর মত পাতিব্রত্য পালন কর, গান্ধারীর মত চোখে সাতপুরু কাপড় জড়িয়ে থাক, সে কি অত সহজেই তা করবে? পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের কতখানি বিকৃত ক'রে ফেলেছে সেটা কি বুঝতে পারছো না বউমা?"

মায়া বলিল, "হ'তে পারে পাশ্চাত্য শিক্ষা এসেছে, কিন্তু আমরা সেই শিক্ষায় শিক্ষিতা হ'য়ে কি নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাব বাবা? অমলা হোক না শিক্ষিতা, তবু সে যদি আজ তার অশিক্ষিত গ্রাম্য-স্বামীকে ঘৃণা করে,

আমি তাকে কোনদিনই প্রশংসা করতে পারব না বাবা। আপনি তার অন্যদিকের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলে দেখছেন, কিন্তু দেখছেন না তার জীবনের আনন্দ, গড়তে গিয়ে ভেঙ্গে ফেললেন তার জীবনের ভিত্তি, তবু তার নিজের বৈশিষ্ট্য থাকবে যদি সে জোর ক'রে বেঁকে দাঁড়ায়।"

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া চন্দ্রমোহন বলিলেন, "অর্থাৎ তুমি বলতে চাও সে আমার বিরুদ্ধাচরণ করুক!"

মায়া চুপ করিয়া রহিল।

তাহার অন্তর বলিতেছিল—হয়ত তাই, কিন্তু প্রকাশ্যে সে শ্বশুরের মুখের উপর সে-কথা বলিতে পারিল না।

চন্দ্রমোহন বলিলেন, "একটি ছেলে ঠিক এমনই করেছে বউমা; আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি, মনোরম শিক্ষালাভের জন্যে বিলেতে গিয়ে একটা মেমকে বিয়ে ক'রে বসবে। আমি তার পাত্রী ঠিক ক'রে রেখেছি—তুমিও তো তাকে দেখেছ মা! সে-মেয়েটির সঙ্গে বাল্য হ'তে সে বাকদত্ত, আজও পুষ্পল অবিবাহিতা রয়েছে—যদিও সে জানে মনোরম বিয়ে করেছে তাকে সে পাবে না। আজও সে প্রায়ই আসে, আমায় দেখে যায়। লজ্জায় আমি মুখ তুলতে পারি নে, তার সঙ্গে কথা বলতে পারি নে, সেও তা বোঝে—তবু সে আসে।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি আবার বলিলেন, "তুমি কি অমুলাকেও তাই হ'তে বল বউমা, সেও আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবে?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

বাহিরে অমুলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—মায়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

পা'খানা টানিয়া লইয়া চন্দ্রমোহন বলিলেন, "তুমি যাও বউমা, অম্লা বাড়ী এসেছে।"

মায়া হাত ধুইতে গেল।

*

* *

অম্লার বাল্য-সখী পুষ্পল।

একদিন এই মেয়েটির সঙ্গেই অম্লার ছোট দাদা মনোরমের বিবাহের কথা ঠিক হইয়াছিল। কথা ছিল, মনোরম বিলাত হইতে ফিরিলেই বিবাহ হইবে, পুষ্পল ততদিন পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিবে।

মনোরম বিলাতে গিয়াছে আজ তিন বৎসর, পুষ্পল অম্লার সহিত ফোর্থ-ইয়ারে পড়ে। সম্প্রতি বিনিময় আসিয়া জানাইয়াছে, মনোরম একটি ইংরাজ-যুবতীকে বিবাহ করিয়াছে, শীঘ্রই সে নব-বিবাহিতা বধূকে লইয়া ভারতে ফিরিয়া আসিবে।

অম্লা ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতায় একেবারে মুসড়াইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পুষ্পল হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেই হাসির আড়ালে যে কতখানি বেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই, সেইজন্যই পুষ্পলের মাতা তাহার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। পুষ্পল উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বলিয়া রাখিয়াছে সে এম-এ পাশ দিয়া বিবাহ করিবে। এতদিন যখন গিয়াছে, আর দুই তিন বৎসরে কিছু আসিয়া যাইবে না।

কন্যার জিদে অগত্যাপক্ষে মাতাকে রাজি হইতে হইয়াছে। পুষ্পল দায় হইতে বাঁচিয়াছে।

অম্বুলার কাছে সে প্রায়ই আসে—চন্দ্রমোহনকে দেখিয়া যায়।

মনোরম যে তাহাকে বিবাহ না-করিয়া মেম বিবাহ করিয়াছে ইহার জন্য সে তাহাকে দোষ দিতে পারে না। সে নিজে শ্যামাঙ্গিনী, সে জানে এ-তাহার মস্ত বড় অপরাধ। অম্বুলার অনুযোগে সে তাই একটু হাসিয়া বলিয়াছিল, "যদি গায়ের চামড়াটা ভগবান আর খানিকটা সাদা ক'রে দিতেন, তাহ'লেও আশা করতে পারতেম অম্বু, কিন্তু প্রধান বাধা যে ওইখানেই কি না, তাই পেছিয়ে রইলেম।"

অম্বুলা রাগ করিয়া বলিয়াছিল, "দাদা মেম বিয়ে করেছে, এর ফল একদিন বুঝবে, কিন্তু তাই বলে তুমিই বা এমনভাবে জীবনটাকে নষ্ট করবে কেন পুষ্পল? দেশে দাদার চেয়ে সুপাত্র অনেক আছে, কাউকে বিয়ে কর।"

পুষ্পল বলিয়াছিল, "করলে তুমি ঘটকালি করবে বোধ হয়—না?"

তাহার পরই গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল, "উপদেশ দেওয়া সোজা, কিন্তু কাজে করাই হয় মুস্কিল। তুমি পারো অম্বুলা—তুমি পারো বিয়ে করতে?"

অম্বুলা আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল—"দূর, আমার বিয়ে যে হ'য়ে গেছে।"

পুষ্পল বলিয়াছিল, "ধ'রে নাও, আমারও বিয়ে হ'য়ে গেছে। আট বছর বয়েসে একটি ছোট ছেলের সঙ্গে তোমার যে বিয়ে হয়েছিল, তার স্মৃতি আজ এই উনিশ-কুড়ি বছর বয়েসেও তুমি ভুলতে পার নি, আমি

এই কিছুদিন আগে যাঁকে স্বামীত্বে বরণ করেছি, এখনই তাঁকে ভুলে গিয়ে আবার বিয়ে করতে পারি ?"

অমলা নীরব হইয়া গিয়াছিল, আর কথা বলিতে পারে নাই।

একমাত্র কন্যার জন্য পুষ্পলের মায়ের উৎকণ্ঠা বড় কম ছিল না। কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে চান, কিন্তু পুষ্পল যে এমনভাবে বাঁকিয়া বসিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

দেশে কি পাত্রের অভাব? তাঁহার পরিচিত জগদীশ সম্প্রতি আই-সি-এস হইয়া আসিয়াছে, মন্মথ মিত্র মস্ত বড় নাম-করা ডাক্তার, হর্ষ বোস বড় ব্যারিষ্টার, ইহারা যে-কেহ পুষ্পলকে বিবাহ করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করে, কিন্তু কি একজেদি মেয়ে—কিছুতেই বিবাহে রাজি হইবে না।

সেদিন মেয়েকে বেশ দু-চার কথা শুনাইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেইদিনই হঠাৎ এক বিপত্তি ঘটিয়া গেল।

অমলা ও পুষ্পল একসঙ্গেই কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। সেদিন আকাশে খুব মেঘ সাজিয়া আসিয়াছিল, পথে খানিকদূর চলিতে ঝর্ ঝর্ করিয়া বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিল।

পথের ধারে দাঁড়াইবার মত দুই একটি আশ্রয় দেখা গেল, কিন্তু সে আশ্রয়গুলি পুরুষেরাই পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের মুখের ভাব দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল, এই দুইটি মেয়েকে তাহারা এতটুকু স্থান দিবে না।

তবু পুষ্পল বলিল, "চল না, গেলে হয়ত একটু জায়গা ছেড়ে দেবে।

ছাতা সঙ্গে নেই, একটা রিক্শা বা কোন গাড়ী দেখা যাচ্ছে না ; ভিজে-ভিজে এমন ক'রে যাওয়ার চেয়ে ওখানে জায়গা নেওয়া ভালো।"

অম্বুলা বলিল, "তুমি ক্ষেপেছ পুষ্পল! ওরা আমাদের জায়গা দেবে মনে করেছ? কেউ এতটুকু সরবে না, জায়গা নিজেদের ক'রে নিতে হবে।"

উত্তেজিত হইয়া পুষ্পল বলিল, "তাই করে নেব। ওরা নিতে পারে, আমরা ক'রে নিতে পারি নে? তুমি এসো—দেখছি।"

অম্বুলা বাধা দিল, বলিল, "এই বৃষ্টিতে বরং ভিজতে-ভিজতে যাওয়া ভালো, তবু ও-রকম কেলেঙ্কারীর মধ্যে যেতে আমি রাজি নই।"

তাহারা জলে ভিজিয়া চলিতেছিল। পাশ দিয়া কয়েকটি লোক যাইতেছিল, তাহাদের হাসি, গল্প, অশ্লীল কথাগুলি বেশ কাণে আসিতেছিল।

একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আঃ, বড় ভিজছেন আপনারা, এই ছাতাটা নিন।"

লোকটার মুখে চোখে দুষ্টামী মাখানো।

অম্বুলা তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া বলিল, "ধন্যবাদ, ছাতা চাই নে, আমরা বাড়ীর কাছেই এসে পড়েছি।"

বাড়ী তখনও অনেক দূরে।

সরু গলির মধ্যে পাশাপাশি যাওয়া মুস্কিল, তিন-চারটি লোক ছাতা লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া, পথ ছাড়ে না।

অতিষ্ঠ হইয়া অম্বুলা বলিল, "ফিরে চল পুষ্পল, ছোটলোক সব!"

"আমরা ছোটলোক নই গো বাছারা!"

তাহারা এমন অশ্লীল কথা বলিল, যাহা শুনিয়া পুষ্পল ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না—পা হইতে জুতা খুলিয়া তাহাদের দিকে ছুঁড়িল।

সেখানে মুহূর্তে তাণ্ডব-কাণ্ড আরম্ভ হইয়া গেল। হয়ত মেয়ে দুইটির পরিণাম ভীষণ হইত, কিন্তু সেই মুহূর্তে আসিয়া পড়িল একটি যুবক, এবং তাহার আকৃতি দেখিয়া গুণ্ডাগুলা নিমেষে নিকটবর্ত্তী গলির মধ্যে উধাও হইয়া গেল।

*

* *

হাঁ, বীরের উপযুক্ত আকৃতি বটে।

দীর্ঘাকৃতি, বলবান ও স্বাস্থ্যশালী। হাতে একটা ছাতা ছিল, সে সেই ছাতাটি মেয়েদের মাথায় ধরিল, বিনয়নম্রকণ্ঠে বলিল, "ভয় পাবেন না, আর ভয় নেই—ওরা পালিয়েছে।"

বৃষ্টিধারা তাহার সমস্ত গা মাথা ভাসাইয়া দিতেছিল। পরণের কাপড়খানা মালকোচা করিয়া পরা, গায়ের সার্ট ভিজিয়া ভিতরের গেঞ্জিটা দেখা যাইতেছিল। মাথার চুলগুলা কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই মুখের পানে তাকাইয়া অমুলা হঠাৎ যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল, সে চোখ ফিরাইতে পারিল না।

পুষ্পল সবিনয়ে বলিল, "কিন্তু আপনি যে ভিজে গেলেন—"

ছেলেটি একবার নিজের পরিধেয়ের পানে তাকাইয়া একটু হাসিয়া বলিল, "ওতে কিছু হবে না, জলে ভেজা, রোদে পোড়া আমাদের বেশ অভ্যেস আছে। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক—সহরের লোক নই।"

সে ফিরিল।

পুষ্পল চলিতে-চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইল—"আপনি যাচ্ছেন কোথায়? ছাতা নিয়ে যাবেন না?"

ছেলেটি বলিল, "থাক্।"

অম্লা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না না, আপনি আসুন, এই সামনেই আমাদের বাড়ী, একটু বিশ্রাম ক'রে যাবেন।"

পুষ্পল পাশেই নিজের বাড়ীতে উঠিয়া গেল, আর খানিকদূর গিয়া অম্লা পথের ধারের বারাণ্ডায় উঠিল।

"আসুন, এই আমাদের বাড়ী।"

যুবক ছাতাটা লইয়া বলিল, "আমি এখন যাচ্ছি, পারি তো আর কোনদিন আসব।"

অম্লা সন্ত্রস্তভাবে বলিল, "না, এখন আপনি গেলে বাবা আমায় খুব বকবেন, আপনি আসুন—"

যুবক বলিল, "আমি দাঁড়াচ্ছি, আপনি কাপড় জামা ছেড়ে আসুন।"

অম্লা ভিতরে প্রবেশ করিয়াই ভৃত্যকে দিয়া কাপড় জামা পাঠাইয়া বলিয়া দিল, "বাবুকে বসতে বল, এখানে চা খেয়ে, বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে তারপর যাবেন।"

সে তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া লইল—মাথা মুছিয়া, চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া প্রস্তুত হইয়া যখন বাহিরের ঘরে আসিল, তখন ছেলেটি কাপড় জামা বদলাইয়া বসিয়াছে।

ভৃত্য আসিয়া টেব্‌লের উপর চা রাখিয়া দিয়া দাঁড়াইল। অম্লা কাপে চা ঢালিয়া আগাইয়া দিতেই যুবক হাতযোড় করিল, সবিনয়ে

বলিল, "ওইটি মাপ করবেন। আমি পাড়াগাঁয়ের লোক, জন্মে কখনও ওই জিনিসটি মুখে দিই নি।"

অমুলার মুখখানা কালো হইয়া গেল, নিজের কাপটাও সে সরাইয়া রাখিল।

যুবক বলিল, "ওকি, আমি খেলাম না ব'লে আপনিও খাবেন না তা হ'তে পারে না। আপনি খান, আমি অপেক্ষা করছি।"

অমুলা চায়ের কাপ মুখে তুলিল।

যুবক বলিতেছিল, "আমাদের সঙ্গে আপনাদের মেলে না, মিলতে পারে না তার কারণ, আপনাদের আর আমাদের শিক্ষা। মানুষ আমরা একই—এ-কথা সত্যি, কিন্তু কতখানি তফাৎ দেখুন। আমি লেখাপড়া হয়ত জানি নে, আপনি হয়ত অনেক জানেন, কাজেই আমাদের চিন্তাধারাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন হ'য়ে গেছে। তারপর দেখুন—আহারে, বসন ভূষণে, সব কিছুতেই আকাশ পাতাল তফাৎ। আপনার পিপাসা পেলে আপনি খান গরম চা, আমি খাই ঠাণ্ডা জল। একটু ঠাণ্ডা বাতাস লাগলে আপনাদের হয় সর্দ্দি, আর আমরা ঝড়-জলের সঙ্গে যুদ্ধ করি—"

বলিতে-বলিতে সে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার সে হাসিতে অমুলা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া তাহার পানে চাহিল।

মণিলাল দরজায় দাঁড়াইয়া সবিনয়ে জানাইল—বাবু একবার ডাকছেন।

কাপড় ছাড়িতে গিয়া অমুলা মায়াকে সংক্ষেপে আজিকার কথাটা বলিয়া আসিয়াছিল, মায়া ইতিমধ্যে চন্দ্রমোহনকে সে-সব কথা জানাইয়াছে। বাতের বেদনা লইয়া চন্দ্রমোহন আসিতে পারেন নাই, নিজের ঘরেই তিনি ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

অমুলা বলিল, "বাবা আপনাকে ডাকছেন, একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন চলুন।"

যুবক বলিল, "আমার আজ কাজ আছে, একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে, এরপর বরং ধীরে-সুস্থে একদিন এসে দেখা করা যাবে।"

অমুলা বাহিরের পানে তাকাইয়া বলিল, "এখনও বেশ বৃষ্টি হ'চ্ছে, আর এ-তো আপনার পল্লীগ্রাম নয় যে জল সরে যাবে, পড়বে গিয়ে পুকুরে, খাল-বিলে? কলকাতার পথে এখন যে জল জমেছে, আপনার কোমর সমান হবে। আর-খানিক আপনাকে থাকতেই হবে যে পর্য্যন্ত-না জল সরে যায়। ততক্ষণ বাবার কাছে বসে গল্প করবেন চলুন!"

যুবক মাথার চুলগুলার মধ্যে আঙ্গুল চালাইতে-চালাইতে বলিল, পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে আপনার কিছু অভিজ্ঞতা আছে দেখছি, কোনদিন পল্লীগ্রামে ছিলেন বোধ হয়?"

অমুলা উত্তর দিল, "ছিলেম না, তবে মাঝে-মাঝে যাওয়া-আসা ছিল ছোটবেলায়, কিন্তু সে-সব কথা থাক্, বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন, কৃতজ্ঞতাটুকু—"

যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল, হাতযোড় করিয়া বলিল, "ওইটুকু মাপ করবেন, ও-সব কৃতজ্ঞতা ব্যাপারের অনুষ্ঠান না-করলেই সুখী হব। দেখা করতে চান, এমনই বরং দেখা ক'রে আসছি চলুন।"

অমুলা তাহাকে সঙ্গে লইয়া উপরের সিঁড়িতে উঠিতে-উঠিতে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম?"

যুবক উত্তর দিল, "আমার নাম রঞ্জন, অর্থাৎ নীহাররঞ্জন মজুমদার।"

অমুলা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল, সে মুহূর্ত্তের

জন্য মাত্র, তাহার পরই সে আবার উঠিতে লাগিল। উপরের বারাণ্ডায় পৌঁছাইয়া সামনের ঘরের দরজার পর্দ্দা সরাইয়া বলিল, "বাবা এই ঘরে আছেন, আসুন।"

চন্দ্রমোহন একখানা ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় বসিয়াছিলেন, মায়া পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে আস্তে-আস্তে কি বলিতেছিল, অমুলা সঙ্গীসহ প্রবেশ করিতেই সে মাথার কাপড়টা ললাটের উপর পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অমুলা যুবকের পরিচয় দিল, ইনিই আজ আমাকে আর পুষ্পলকে গুণ্ডার অত্যাচার হ'তে রক্ষা করেছেন বাবা।"

যুবক দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, সোজা হইয়া বসিয়া চন্দ্রমোহন চোখের চশমা ভালো করিয়া বসাইয়া যুবকের পানে তাকাইলেন—"বটে বটে, বউমার মুখে তাই শুনছিলেম। বেঁচে থাক বাবা, তোমাদের মত ছেলে আছে ব'লেই আজ মেয়েদের মানসম্ভ্রম রক্ষা হয়। ব'সো বাবা,—এই মণি, বেটা গেল কোথায়? চেয়ারখানা এগিয়ে দে।"

ছেলেটি একটু হাসিয়া নিজেই একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া ঠিক তাঁহার সামনে বসিল, অমুলার দিকে তাকাইয়া বলিল, "আপনিও বসুন।"

অমুলা বলিল, "আমি এখুনি আসছি, আপনি বাবার সঙ্গে ততক্ষণ গল্প করুন। বৃষ্টি না-কমলে, পথের জল না-সরলে তো যেতে পারবেন না?"

জানালাপথে বাহিরের বৃষ্টিধারার পানে তাকাইয়া চন্দ্রমোহন সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা, আজ কলকাতা একেবারে জলে ভেসেছে, তুমি একটি পাও চলতে পারবে না। হ্যাঁ, তোমার নামটি কি?"

ছেলেটি উত্তর দিল, "নীহাররঞ্জন মজুমদার।"

অমুলার দিকে তাকাইয়া চন্দ্রমোহন বলিলেন, "চা দেওয়া হয়েছে ?"

অমুলা বলিল, "উনি চা খাননা বললেন, পাড়াগাঁয়ের লোক, চা ওঁদের সহ্য হয় না।"

সে বাহির হইয়া গেল।

*

* *

পরদিন নীহাররঞ্জন যখন বৈকালিক-নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল তখন বাড়ীতে বেশ একটি ছোটখাট বৈঠক বসিয়াছে।

চায়ের টেব্‌লে বসিয়াছে বিনিময়, নিরুপম, রণেন্দ্র, মিঃ মিত্র, বসু ইত্যাদি। চন্দ্রমোহনের ঘরেই আজকাল চায়ের আড্ডা বসে। তিনি বাতের বেদনায় কোথাও যাইতে পারেন না, অথচ সকলের সহিত চা খাইতে-খাইতে গল্প করা তাঁহার জীবনের একমাত্র নেশা।

নানা দেশ-বিদেশের গল্প চলিয়াছে—নানা আজগুবী-ই তাহার মধ্যে আছে। সে-সব কথার সত্য-মিথ্যা লইয়া দ্বন্দ্ব হইতেছে, আবার মীমাংসাও হইয়া যাইতেছে।

নীহাররঞ্জন দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতে সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল; অমুলা ডাকিল, "আসুন!"

সঙ্কুচিত নীহার ভিতরে প্রবেশ করিল। অমুলা একখানা চেয়ার দেখাইয়া বলিল, "বসুন।"

চন্দ্রমোহন সকলের কাছে তাহার পরিচয় দিলেন—"এই সেই ছেলেটি, যে সেদিন অম্বুলা আর পুষ্পলকে গুণ্ডার হাত হ'তে বাঁচিয়েছিল।"

নিরুপম উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাতখানা বাড়াইয়া দিল—"আসুন, আসুন, বসুন। উঃ, আপনি না থাকলে—"

অম্বুলা বলিল, "উনি না থাকলে আমাদের যে কি দুর্গতি হ'তো তা সহজেই বলা যায়। আশপাশে অনেক বাড়ী থাকলেও সে দুর্যোগের সময় সব বাড়ীতেই দরজা জানলা বন্ধ ; সরু গলি, পালানোরও পথ ছিল না।

বিনিময় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া নীহারের পানে তাকাইয়াছিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাড়ি ?"

নীহার কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিল, "গ্রামে।"

বিনিময় মাথাটা কাত করিয়া বলিল, "হুঁ, তা দেখেই বুঝেছি।"

রণেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে বুঝলে ?"

বিনিময় একটু হাসিয়া বলিল, "গ্রামের মানুষ চিনতে কি একটুও দেরি হয় ?"

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল—অম্বুলা বাধা দিল, বলিল, "থাক্, আর গ্রামের নিন্দা নাই-বা করলেন বিনিময়বাবু, বাইরে থেকে দেখে গ্রামের বিচার করা চলে না, বিচার করতে গেলে গ্রামে গিয়ে বাস করতে হয়, ওর অধিবাসীদের সঙ্গে মিশতে হয়, তবেই যদি বিচার করা যায়।"

মিঃ মিত্র সিগারেটের ছাই আঙ্গুলের চেটো দিয়া ঝাড়িতে-ঝাড়িতে বলিলেন, "আপনাদের গ্রামে বোধ হয় ম্যালেরিয়া নেই, না ?"

নীহারের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, বলিল, "না।"

মিঃ মিত্র বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "বাংলায় এমন পল্লীও আছে—আশ্চর্য্য তো!"

মিঃ বসু গম্ভীর মুখে বলিলেন, "অর্থাৎ সাবধানের বিনাশ নাই। এবারে কেউ যদি বাংলার ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে কিছু বলে বা লিখে পাঠায় সাহায্যের জন্যে, সোজা জবাব দেবার মত তবু একটা মুখ রইল।"

নিরুপম চায়ের একটা কাপ নীহারের দিকে আগাইয়া দিল, অমুলা আস্তে-আস্তে সেটা সরাইয়া রাখিল, এ-দৃশ্য বিনিময়ের চোখ এড়াইল না এবং অন্তরে সে বিলক্ষণ জ্বালাও অনুভব করিল। বলিল, "আপনি চা খাননা বুঝি?"

অমুলা উত্তর দিল, "না।"

বিনিময় একবার নীহারের সারা দেহে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—"এবার যাওয়া যাক, বড় জরুরী কাজ আছে।"

সে চলিয়া যাইবার সঙ্গে-সঙ্গে একে একে সবাই বিদায় লইলেন, রহিল কেবল নীহার।

নিরুপমও শিস্ দিতে দিতে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল, অমুলা পিতার পার্শ্বের চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া বসিল।

নীহার একটু আগাইয়া আসিল। গম্ভীরমুখে বলিল, "আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

চন্দ্রমোহনের চায়ের কাপ তখনও শেষ হয় নাই, তিনি আস্তে-আস্তে চা খাইতেছিলেন।

নীহারের কথা বলার ভঙ্গীতে চমকাইয়া উঠিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সঙ্গে?"

নীহার উঠিয়া দাঁড়াইল, সামনের টেব্‌লের উপর ভর দিয়া বলিল, "আমি আপনার সঙ্গে—কেবল আপনার সঙ্গে নয়, আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রতারণা করেছি, আমায় মাপ করতে হবে।"

"প্রতারণা করেছ—তুমি?"

চন্দ্রমোহন সোজা হইয়া বসিতে গেলেন, পায়ে নাড়া লাগায় হাঁটুটা কন্‌কন্ করিয়া উঠিল, সেদিকে মোটে মনোযোগ না দিয়া চন্দ্রমোহন বলিল, "কি প্রতারণা করেছ—কিসের প্রতারণা?"

নীহার উত্তর দিল, "অর্থাৎ আমার নাম নীহাররঞ্জন মজুমদার নয়, শুধুই রঞ্জনকান্তি ঘোষ, আমার বাড়ী রুদ্রপুর গ্রামে।"

"তুমি? তুমি? তুমিই রঞ্জন? রঞ্জন ঘোষ, অমলার—"

রঞ্জন উত্তর দিল, "হ্যাঁ, স্বামী। আপনার জামাতা, আমিই সেই।"

চন্দ্রমোহনের হাত হইতে কাপ ডিসটা মাটিতে পড়িয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা হইয়া গেল, বিষম নাড়া পাইয়া পা ভীষণ কন্‌কন্ করিতে লাগিল; কোনদিকে দৃষ্টি না দিয়া মূঢ়ের মত বারবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি—তুমিই রঞ্জন? অমলার সঙ্গে বাল্যকালে তোমারই বিয়ে হয়েছিল?"

রঞ্জন নিঃশব্দে কেবল মাথা কাত করিল।

অমলা তখনও পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। তাহার গতিশক্তি যেন রহিত হইয়া গিয়াছে, দেহের সমস্ত রক্ত মুখে জমা হইয়াছে, দুইটি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে রঞ্জনের পানে তাকাইয়াছিল।

মনে কি আট বৎসর বয়সের ছাপ আজও জাগিয়া ছিল? পথে প্রথম দর্শনেই অমলা চমকাইয়া উঠিয়াছিল, মনে হইয়াছিল ইহাকে সে চেনে, কোনকালে যেন ইহাকে সে দেখিয়াছিল।

স্মৃতির খাতার পাতা উল্টাইয়া সে দেখিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। একটি বালককে মনে পড়ে, কিন্তু তাহার আকৃতির সহিত ইহার বিন্দুমাত্র মিল ছিল না।

বিস্ফারিত-নেত্রে অমলা কেবল তাকাইয়া রহিল, মুখ সে ফিরাইতে পারিল না।

রঞ্জন বলিতেছিল, "মা আপনাকে পত্র দিয়েছেন, সে-পত্র বোধ হয় পেয়েছেন। মার খুব অসুখ, হয়ত আর বেশীদিন বাঁচবেন না, সেই জন্যে শেষ একবার ওঁকে দেখতে চান। সে-পত্র পান নি কি?"

চন্দ্রমোহন এতক্ষণে একটা দম লইলেন, বলিলেন, "পেয়েছি, কিন্তু—"

রঞ্জন তাঁহাকে থামিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু মানে, পাঠাবেন না?"

চন্দ্রমোহন বলিলেন, "সে-কথা পরে হবে এখন, এখুনি যে বলতেই হবে তার মানে নেই। আমি শুধু ভাবছি, তোমার প্রতারণা করবার কি হেতু ছিল, তুমি একেবারে সোজা এলেই পারতে?"

রঞ্জন বলিল, "আসতে সাহস করি নি। আপনারা আমায় মেনে নেবেন কি না তা' তো জানতেম না, কাজেই ইতস্তত: করেছিলেম। মা আমাকে পাঠিয়েছেন নিয়ে যাওয়ার জন্যে, ভগবানের ইচ্ছায় পথের মাঝেই ওঁদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল—যদিও পরিচয় হয় নি। আজও অনেক ইতস্তত: ক'রে এসে পড়েছি, নিজের পরিচও দিয়ে ফেলেছি। আশা করছি, আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন।"

অমলা আস্তে-আস্তে পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

চন্দ্রমোহন বলিলেন, "সে-সব কথা হ'চ্ছে, এখন ব'সো। এসেছই যদি

—এখুনি তোমায় ছেড়ে দিতে পারছি নে। আমার ছেলে নিরুপমের সঙ্গে দেখা-শোনা হোক, কথাবার্ত্তা হোক,—ওরে মণিলাল, নিরুপম বাড়ী আছে কি না দেখ তো!"

মণিলাল দরজার কাছেই ছিল, প্রভুর আদেশ পালন করিতে গেল।

একটুপরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু বাড়ী নেই, রাত দশটায় ফিরে আসবেন বলে গেছেন।"

রঞ্জন বলিল, "থাক্, কাল তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবে। আজ আমি যাচ্ছি, কাল এলে দয়া করে জানাবেন, ওঁকে পাঠাবেন কি না।"

বিনীতভাবে অভিবাদন করিয়া সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রমোহন বলিলেন, "নিশ্চয়ই, সেটা আমিও ভাবব, অমূলাও ভেবে দেখবে। সে তো ছেলেমানুষ নয়, নিজেরও তাঁর মত আছে, নিজের মতে সে যা' ভালো বুঝবে তাই করবে।"

রঞ্জনের মুখে মৃদুহাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, বলিল, "হ্যাঁ, তাঁকেও ভালো ক'রে ভেবে দেখতে বলবেন।"

সে যখন বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার মুখের সে হাসি মুছিয়া গিয়াছে, গভীর বিরক্তিতে তাহার সুন্দর মুখখানা ভরিয়া উঠিয়াছে।

একটা নিঃশ্বাস সে রুদ্ধ করিতে পারিল না—সঙ্গে-সঙ্গে মনে জাগিয়া উঠিল জননীর কাতর অনুরোধ।

রঞ্জন আসিতে চায় নাই, কিন্তু রুগ্না মা যখন তাহার হাত দু'খানা নিজের শীর্ণ হাতের মধ্যে লইয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "একবার যা রঞ্জন, এই প্রথম আর এই শেষ চেষ্টা, আর বলব না।"

তখন রঞ্জন আর আপত্তি করিতে পারে নাই। আসিতে স্বীকৃত হইয়াও সে বলিয়াছিল, "কিন্তু মা, আমি লেখাপড়া জানি নে, গরীব, আমার এই কুঁড়ে-ঘরে কি ধনীর শিক্ষিতা মেয়ে আসবে?"

মা চোখের জল মুছিয়া গাঢ়স্বরে বলিয়াছিলেন, "আমি বলছি সে আসবে। আমরা আনতে যাই নি বলেই বউমা আসতে পারে নি, তুই একবার আনতে যা দেখি, দেখি সে কেমন না এসে থাকতে পারে! সে যে বাংলার মেয়ে রে, এই বাংলা দেশেরই বউ, কতক্ষণ তার জেদ আর শিক্ষার অহঙ্কার থাকতে পারে? তাকে আসতেই হবে এ-আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।"

রঞ্জনের মনে এই মুহূর্ত্তেই সেই কথাই জাগিয়া উঠিল—সে বাংলার মেয়ে—বাংলার বউ; এদেশের মেয়েরা সে-কথা কোনদিনই ভুলবে না, ভুলতে পারবে না। সে যেদিকেই যাক, তাকে আবার ফিরে আসতে হবে সেই একই কেন্দ্রে।

রঞ্জন ক্লান্তপদে চলিল।

*

* *

অমূলা সেদিন কলেজ যায় নাই।

সামনে একজামিন আসিতেছে, অথচ সে পড়া করিতে পারে নাই।

সামনে টেব্‌লের উপর বই খোলা পড়িয়াছিল, অমূলা দুই করতলের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া ভাবিতেছিল।

আজই সকালে চন্দ্রমোহন তাহাকে ডাকিয়াছিলেন।

কন্যার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "রঞ্জন তোমায় নিতে এসেছে, তুমি কি তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে রুদ্রপুরে যেতে চাও অম্লুলা ?"

অম্লুলা উত্তর দিতে পারে নাই।

চন্দ্রমোহন বলিয়াছিলেন "আজ দশ-এগারো বৎসর তোমার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু আমি তাকে বিয়ে বলে স্বীকার করি নি, কারণ সত্যিই সে একটা ভীষণ প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। অভিভাবকের মত না-নিয়ে তার শিশু-কন্যার বিবাহ দেওয়ার জন্যে আমি কেস আনতে পারতেম, কিন্তু সেটা নেহাৎ কেলেঙ্কারী হ'তো—অরুন্ধতী শুদ্ধ্ জড়িয়ে পড়তো, কেবল সেইজন্যেই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু একে কি বিবাহ বলতে পারি অম্লুলা ? কখ্খনো না।"

অম্লুলা নীরব।

উত্তেজিত চন্দ্রমোহন বলিয়াছিলেন, "ওই মূর্খ দরিদ্র গ্রাম্য-লোকটাকে জামাই বলে মেনে নিতে আমার মাথা নুইয়ে পড়ে অম্লুলা, আমি পারব না—কখ্খনো পারব না ওকে মেনে নিতে। আমি জানি, তুমিও পারবে না। তবুও তোমায় বলছি, তুমি বেশ ক'রে ভেবে দেখ গিয়ে, তারপরে আমায় জানিয়ো কি তুমি ঠিক করলে।"

অম্লুলা বাহির হইয়া আসিয়াছে—সে ভাবিতে বসিয়াছে।

সে বাংলার মেয়ে—বাংলার বউ। আজ কেবল 'মেয়ে' নামেই তাহার পরিচয় দেওয়া চলে না, অথচ 'বাংলার বউ' নামে পরিচয় দেওয়ার মূলেও রহিয়াছে কি অসম্ভব বাধা !

অমুলা ভাবিয়া পায় না সে কি করিবে। পুষ্পল থাকিলেও জিজ্ঞাসা করা যাইত, কিন্তু সে কাল সকালে তাহার মায়ের সহিত দেওঘর চলিয়া গিয়াছে।

মায়ার কাছে এ-সব কথা তুলিতে লজ্জা করে। .

অমুলা বেশ জানে সে মত দিলেও পিতা ও দাদা কিছুতেই অনুমোদন করিবেন না, রঞ্জনকে তাঁহারা এতটুকু অধিকার দিবেন না।

সমস্ত দিনটা এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় পিতা যখন ডাকিয়া পাঠাইলেন, তখন দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অমুলা জানিল, রঞ্জন আসিয়াছে।

পিতার ঘরে যাইতে-যাইতে রঞ্জনের কণ্ঠস্বর শুনিল, "আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি নে, দয়া ক'রে একটু বুঝিয়ে বললেই ভালো হয়।"

নিরুপমের কণ্ঠ শুনা গেল, "এর মধ্যে বোঝানোর মত কথা কিছুই নেই রঞ্জনবাবু, আসল কথা—আমরা কিছুতেই এ-বিয়ে মেনে নিতে পারি নে।"

অমুলা প্রবেশ করিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইল।

বিনিময় সামনের টেব্‌লে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "কিছুতেই না। এ কি বিয়ে—বিয়ে বলা যেতে পারে কখনও? বাপ, মা, ভাইয়েরা কেউ কিছু জানতে পারলে না—সাত-আট বছরের একটা মেয়ে, যে কিছু বোঝে না, জানে না, তাকে দেওয়া হ'লো বিয়ে!"

মিঃ মিত্র বলিলেন, "তার না-আছে মত, না-আছে জ্ঞান।"

আইনজীবী মিঃ বোস বলিয়া উঠিলেন, "এর জন্যে রীতিমত কেস আনা চলে, আর আমার মনে হয়—আনাও উচিত। এ-রকম ব্যাপার নিয়ে ডাইভোর্স সহজেই করা যায়।"

রঞ্জনের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি অত্যন্ত শান্ত ও সংযতকণ্ঠে সে বলিল, "না, অতদূরে এগিয়ে যেতে হবে না, বিয়েই যখন আপনারা মানতে রাজি নন, তখন ডাইভোর্সের কথাই-বা আসবে কেন? কেস আনার কথাটাও কাজেই বাজে হ'য়ে যাবে, মিথ্যের ওপর ইমারত গড়া চলবে না।"

তাহার শান্ত-সংযত ভাব সকলেরই মন স্পর্শ করিল।

নিরুপম কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া বলিল, "অবশ্য আমরা আপনাকে ঠিক অপমানই করতে চাই নে রঞ্জনবাবু।"

মুখে একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া রঞ্জন বলিল, "হ্যাঁ, তা আমি বুঝেছি। আমিও এ-ব্যাপারটাকে ঠিক অপমান ব'লে ভাবছি নে, কেন না আমি প্রথম থেকেই জানি এ-রকম ব্যবহার আমি পাবই।"

বিনিময় বিনাইয়া-বিনাইয়া বলিতে গেল, "তবে জেনে-শুনে আসাটা—"

বাধা দিয়া রঞ্জন বলিল, "ওইখানেই ঘটেছে আমার দুর্ব্বলতা। কেবল আমার মায়ের শেষ অনুরোধ রক্ষা করব বলেই এসেছিলেম—যদি উনি দয়া ক'রে গরীবের পর্ণ-কুটীরে একবার পদার্পণ করেন। কি জানেন, মানুষ আশা ছেড়ে দিয়েও আশা করে কি না, আর এ-আশা আমার মনে জাগিয়ে তুললেন আমার মা—তিনিই আমায় বললেন তাঁর বউমা যাবেই তাঁর ওখানে, কারণ সে বাংলার বউ। মেয়ে হিসেবে সে যা' জানতে পারে নি, বউ হিসাবে তা' জানবে এবং ঠিক বাংলার বউ হ'তে প্রাণপণে চেষ্টা করবে।"

একমুহূর্ত্ত থামিয়া অতুলার দিকে তাকাইয়া সে বলিল, "আমার মা যে

কত বড় ভুল করেছেন তা' আমি বুঝেছি, তিনিও বুঝবেন, কিন্তু এতে আমার বা তাঁর দুঃখ করবার কারণ নেই, কেননা এটা হ'তোই এবং হ'চ্ছেও তাই।"

গোঁ-গোঁ করিয়া মিঃ বোস আস্তে-আস্তে বলিল, "দুঃখ—এতে আবার দুঃখ! রীতিমত ক্রিমিনাল কেস—"

রঞ্জন বলিল, "আবার কেন সে-কথা তুলছেন, কেস হবে কি ক'রে? আমি তো কোনদিন সম্পর্ক নিয়ে আসি নি—আজও কেবল আপনাদের মেয়ের মুখ থেকে একটি কথা শুনে যেতে চাই, উনিও কি আমাদের বিয়ে স্বীকার করেন না?"

চন্দ্রমোহন উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "না, ও তা' মানে না। বিয়ে—বিয়ে একটা ছেলেখেলা কিনা!"

রঞ্জন বলিল, "ছেলেখেলা নয় ব'লেই তা জিজ্ঞাসা করছি। হিন্দুর বিয়ে কেবল ইহকাল নিয়েই নয়, পরকাল নিয়েও বটে, অন্ততপক্ষে হিন্দুশাস্ত্র এ-কথা বলে। আপনারা হিন্দুধর্ম্ম মেনে চলেন, কেবল সেই জন্যেই অবশ্য এ-কথা বলা, নইলে কোন দরকারই হ'তো না বলবার।"

নিরুপম রাগ করিয়া বলিল, "হিন্দুধর্ম্ম মানি ব'লে যে ইহলোক পরলোক মানতে হবে এমন কি কথা আছে?"

রঞ্জন হাসিল, বলিল, "ঐ-তো, মানতেই হবে যে, হিন্দুধর্ম্ম মানতে গেলেই ইহলোক পরলোক, জন্মান্তর প্রভৃতি সবই মানতে হবে। মন ছাড়া যেমন দেহ নয়, দেহ ছাড়াও মন নয়; এ-যেমন পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে, ধর্ম্মের সঙ্গে ও-গুলোও তেমনি জড়িয়ে আছে, বাদ দেওয়া কিছুতেই চলে না।"

মিঃ মিত্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ও-সব বাজে কথা এখন থাক্, আসল কথার মীমাংসাটাই হ'য়ে যাক আগে।"

রঞ্জন বলিল, "আমিও তো তাই চাচ্ছি, ওঁর কি মত শুধু সেইটুকু শুনতে পেলেই আমি চ'লে যাই।"

অধৈর্য্য হইয়া চন্দ্রমোহন বলিলেন, আমিই ওর কথা ব'লে দিচ্ছি। তুমি কি মনে কর, একটি গ্র্যাজুয়েট-মেয়ে তোমাকে স্বামী ব'লে নিয়ে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'রে ফেলবে?"

রঞ্জন অমুলার পানে তাকাইয়া সস্মিতমুখে বলিল, "এ-কথা ওঁর মুখ দিয়ে বলানোর চেয়ে নিজের মুখে বললেই ভালো হ'তো। যাই হোক, আশ্বস্ত হ'য়ে চললেম যে এ-তোমার নিজেরই কথা। আচ্ছা, এরপর আর আমার এখানে থাকা শোভা পায় না, আমি উঠি।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল, সকলকে নমস্কার করিয়া ধীরপদে বাহির হইয়া গেল।

অমুলা খানিকক্ষণ পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে-আস্তে বাহিরে আসিল।

নিজের ঘরের বারাণ্ডার রেলিংয়ে ভর দিয়া সে তাকাইয়া রহিল আকাশের পানে।

একপাশে সান্ধ্য-তারাটি জ্বল্-জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছিল, এদিকে-ওদিকে আরও হাজার-হাজার তারা আকাশের গায়ে ছড়াইয়া উঠিয়াছিল। প্রতি-পদের ক্ষীণ চাঁদ মুহূর্ত্তের জন্য রেখার মত জাগিয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আকাশের এককোণে সেই সান্ধ্য-তারাটির পানে তাকাইয়া-তাকাইয়া অমুলার চোখ দুইটি জ্বালা করিতে লাগিল।

নিকটে টবে বেলফুলের গাছে অসংখ্য বেলফুল ফুটিয়াছিল, বাতাসে তাহার গন্ধ সমস্ত ছাদময় ছড়াইয়া পড়িতেছিল। কোথা হইতে একটা পোষা কোকিল ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

দূরে মায়ার কথা শোনা গেল—"অমুলা কোথায় গেল, কই, পড়ার ঘরে নেই তো! সামনে একজামিন আসছে, আর ক'টা দিন পরেই একজামিন দিতে হবে, এখন এমন ক'রে চললে সোজা ফেল করবে যে!"

অমুলা চট্ করিয়া চোখ দুইটি দুই হাতে ডলিয়া লইল।

*

* *

রুদ্রপুর গ্রাম।

ষ্টেশন হইতে গ্রাম অনেক দূর। আগে লোকে হাঁটিয়া বা গরুর গাড়ীতে করিয়া যাতায়াত করিত, এখন বাস হওয়ায় অনেকের সুবিধা হইয়াছে।

গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থের সংখ্যা কম, অনুন্নত জাতির সংখ্যা বেশী। আজ এই প্রগতির যুগেও তাহারা ব্রাহ্মণকে দেবতার মত মানে, ব্রাহ্মণের কথা বেদবাক্য বলিয়া মনে করে।

রঞ্জন যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছাইল তখন বেলা প্রায় চারটা বাজিয়া গিয়াছে।

মায়ের আজ কয়দিন জ্বরটা একটু বেশী করিয়াই হইতেছে; ঘরের

ভিতরে ছিলেন, রঞ্জনের সাড়া পাইয়া কাঁথা জড়াইয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন।

মন সবই বুঝিয়াছিল, তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'লো বাবা ?"

হাতের বোঁচ্‌কাটা বারাণ্ডার একপাশে নামাইয়া রঞ্জন মাকে প্রণাম করিল—"সে-সব কথা পরে হবে এখন মা, আগে তোমার কথা বল। বড্ড বেশী জ্বর হয়েছে, আর উঠতে পারো না শুনলেম ?"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সব কথা শুনলি কোথায় ?"

রঞ্জন বলিল, "শুনতে কি কিছু বাকি আছে মা, সবাই বলছে। পথে আসতে-আসতেই শুনলেম তোমার জ্বর, কেউ দেখতে নেই—"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "সে-কথা সত্যি নয় রঞ্জু, দেখবার লোক কেউ না-থাকলে তোর মা এ-ক'দিনে মরে ভূত হ'য়ে থাকতো। অর্চ্চনা আমার এখানেই তো থাকে—পথ্য, দেখাশোনা সবই সেই করছে।"

অর্চ্চনা পাশের বাড়ীর মেয়ে, জগতে তাহার কেহই নাই বলিলেই হয়। স্বামী আছে, কদাচিৎ আসে যখন নেহাৎ টাকা-পয়সার দরকার হয়।

অবস্থা মোটেই ভালো নয়, কয়েক বিঘা জমিমাত্র সম্বল, পিতা মৃত্যুকালে কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া লেখাপড়া করিয়া দিয়াছেন, তাহার জীবনকালে সে এ-জমি বিক্রয় করিতে পারিবে না।

চৈতন্যদাস এই জমি কয়-বিঘার জন্য স্ত্রীকে উৎপীড়ন করিয়াছিল বড় কম নয়। শেষ পর্য্যন্ত শ্বশুরের উইল দেখিয়া আর জোর করিতে পারে নাই, কিন্তু জমির বদলে সে সব-কিছুই আদায় করিয়া ছাড়িত।

ইহার জন্য চলিত উৎপীড়ন, অত্যাচার, এমন কি অনেক সময় প্রহার, তথাপি এই মেয়েটি অটুট ধৈর্য্যের সহিত সেই স্বামীরই সেবা-যত্ন করিত।

প্রায় একাই সে কাটাইত, ছয়মাস-নয়মাস পরে হয়ত হঠাৎ কোনদিন চৈতন্য আসিয়া উপস্থিত হইত। এতদিন সে কোথায় কি ভাবে যে কাটাইত তাহা কেহই জানিত না।

রঞ্জন তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিত। গাঁজাখোর, মাতাল চৈতন্যকে সে সহ্য করিতে পারিত না, চৈতন্যও কোনদিন এই গুণ্ডা-প্রকৃতি লোকটির সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই।

অর্চ্চনা যে স্বেচ্ছায় আসিয়া মায়ের সেবার ভার লইয়াছে, ইহাতে রঞ্জন মনে-মনে খুশী হইলেও মুখে সে-ভাব প্রকাশ করিল না; বলিল, "তাকে তো আমি কিছু বলে যাই নি মা, তবে সে হঠাৎ এলো কেন?"

মা রাগ করিয়া বলিলেন, "এলো কেন? তুই না-বললেই-বা, তার এ-টুকু দয়া আছে—কারও কষ্ট সে সইতে পারে না।"

মায়ের রাগ দেখিয়া রঞ্জন হাসিল, বলিল, "বোঝ না মা, ওর স্বামীটি যে-প্রকৃতির লোক তাতে ওকে বিশেষ আমল না-দেওয়াই উচিত। জান তো, অর্চ্চনা আগে আমার সঙ্গে কথাও বলতো, স্বচ্ছন্দে আসা-যাওয়াও করতো। এইটুকু খুঁত পেয়ে তার স্বামীটি কি নির্য্যাতনই না করেছিল। আমি লোকটাকে একবার সামনে পেতে চেয়েছিলেম, তাকে একবার বুঝিয়ে দিতেম, অর্চ্চনার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, কিন্তু সে সেই থেকে দিনের বেলায় রুদ্রপুর আসাই ছেড়ে দিয়েছে, পাছে আমার সঙ্গে দেখা হয়।"

কথাটা বলিয়া সে যতটা স্ফূর্ত্তির সঙ্গে হাসিতে গেল, ততটা স্ফূর্ত্তির সঙ্গে হাসি ফুটিল না।

পিছনের বেড়ার দরজাটা কে যেন খুলিল।

মা বলিয়া উঠিলেন, "ওই অর্চ্চনা এসেছে।"

অবহেলার সঙ্গে রঞ্জন বলিল, "এসেছে তাতে আর কি? আমি তো লুকিয়ে ওর স্বামী-দেবতার নিন্দে করছি নে, সামনা-সামনিই করছি—করবও।"

অর্চ্চনা আগাইয়া আসিতে-আসিতে হাসিমুখে বলিল, "খুব করতে পারো রঞ্জুদা, দোষ করবে—বলবে না? আমি কখনও তাতে একটি কথা বলেছি, তুমি বল?"

রঞ্জন বলিল, "বলবি কি, বলবার মত মুখ আছে তোর? কি স্বামীটি-ই পেয়েছিস অর্চ্চনা—মাতাল, গাঁজাখোর, বউকে মারে—"

অর্চ্চনা হাসিমুখেই সব মানিয়া লইল—"যা বলেছ দাদা, সব দোষ ক'টাই বর্ত্তমান। শুধু মদ নয়, গাঁজা নয়—আফিঙ আছে, তামাক আছে, তা'ছাড়া দোক্তা 'খইনি' সব কিছুই চ'লে থাকে।"

রঞ্জন যেন চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "তাই মহাপ্রভুর চেহারাটি অমনি, একেবারে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। পা দু'খানি যেমন ফাটা তেমনি পাঁচড়ায় ভরা। আচ্ছা অর্চ্চনা, ওই পায়ে রোজ তেল গরম ক'রে দিস তো?"

অর্চ্চনা উত্তর দিল, "তা দিতে হয় বই-কি রঞ্জুদা, তোমার বউয়ের মত তো উঁচু শিক্ষা পাই নি—বড়লোকের মেয়েও নই। লেখাপড়া যেটুকু শিখেছি তাতে বড়-জোর রামায়ণ, মহাভারত পড়াই চলে, আর রামায়ণ, মহাভারত এই শিক্ষাই দিয়ে থাকে যে, স্বামী যেমনই হোন-না তাঁর সেবা করতে হবে, যেখানেই থাকুন—হোক-না সে গাছতলা, সেইখানেই তাঁর সঙ্গে বাস করতে হবে।"

রঞ্জন মুহূর্ত্তকালমাত্র তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া চক্ষু ফিরাইল।

অর্চ্চনা মায়ের পানে তাকাইয়া ভৎ র্সনার সুরে বলিল, "যা বারণ করি তাই; বললেম, মাসীমা বাইরে সন্ধ্যেবেলায় এসো না, ঠাণ্ডা লাগবে, কথা না-শুনে সেই সন্ধ্যেবেলাতেই বাইরে এসে বসা হয়েছে। একে এই জ্বর, তার ওপর আবার ঠাণ্ডা লেগে নি-মোনিয়া ধরুক—সোনায় সোহাগা হোক।"

মঙ্গলাদেবী একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "এখনও সন্ধ্যে হ'তে দেরি আছে মা। রঞ্জন এলো, কি হ'লো তাই জানবার জন্যে—"

ঝঙ্কার দিয়া অর্চ্চনা বলিল, "কি আবার হবে, যা হয়েছে তা' তো বোঝাই যাচ্ছে, ও-আর জিজ্ঞাসা ক'রে জানবার দরকারই বা কি?"

মঙ্গলাদেবী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

রঞ্জন বলিল, "সত্যিই মা, জিজ্ঞাসা করবার আর কোন দরকারই হবে না, কেননা এ-তো জানা কথা। বড়লোকের শিক্ষিতা মেয়ে কোনদিন পাড়াগাঁয়ে এই অশিক্ষিতের কুঁড়ে ঘরে আসবে, এ-আশা আজও তোমার মনে জাগছে কি ক'রে আমি তাই ভাবছি।"

সে উঠিল, অর্চ্চনার দিকে চাহিয়া বলিল, "যাই, হাত-পা ধুয়ে আসি. ঘরে কিছু আছে না কি রে—খাওয়ার মত?"

অর্চ্চনা বলিল, "হাত-পা ধুয়ে এসো তো, তারপর দেখা যাচ্ছে।"

বাড়ীর পাশে একটা ছোট পুকুর। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠমাসে জল একেবারেই থাকে না, এ-সময় অর্থাৎ মাঘ-ফাল্গুনে তবু কতকটা থাকে।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার গ্রামের সীমানায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ধীরে-ধীরে সে অন্ধকার অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। দূরে-দূরে কুটীরগুলিতে এক-

একটি আলো জ্বলিয়া উঠিল, গৃহস্থ-বধূ সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইয়া শঙ্খধ্বনি করিল।

আকাশের কোলে সান্ধ্য-তারা জাগিয়া উঠিল পথশ্রান্ত পথিককে পথ দেখাইবার জন্য, লক্ষ জোনাকি গাছের পাতার ফাঁকে-ফাঁকে ঝিকৃমিক্ করিয়া উঠিল।

রঞ্জন অন্যমনস্কভাবে কোন্‌দিকে তাকাইয়া রহিল কে জানে !

সামনে জাগিল দুইটি মেয়ে। একটি তাহার স্ত্রী অমুলা, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়ে—অপরটি অর্চ্চনা, তাহাকে শিক্ষিতা বলা চলে না, গ্রাম্য-পাঠশালায় সামান্য একটু লেখাপড়া শিখিয়া কোনমতে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারে।

উভয়ের মধ্যে কতখানি পার্থক্য ! রঞ্জন একটা নিশ্বাস ফেলিল।

অমুলা—অমুলা !

ছোটবেলায় কবে বিবাহ হইয়াছিল, কবে কে কাকে দেখিয়াছিল তাহা মনে পড়ে না।

প্রথম দেখা হইল পথের মাঝে, বিপদের মাঝে।

সেই অমুলা ! সে আজ তরুণী, কত বড় হইয়াছে।

রঞ্জন মন ফিরায়।

দূর হোক অমুলা, সে তাহার কে ? অমুলা সম্পর্ক রাখিতে রাজি নয়, সে চায় বিবাহ-বিচ্ছেদ !

তাহাই যদি হয়, হোক না, রঞ্জনের তাহাতে কি ? অমুলা যদি সুখী হয় - হোক, রঞ্জন যেমন আছে তেমনই থাকিবে।

হাত পা ধুইয়া সে ফিরিল।

*

* *

রুগ্না মায়ের মাথার কাছে বসিয়া রঞ্জন মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে আকাশ-পাতাল ভাবে।

বৈকালে ডাক্তার দেখিয়া গিয়াছেন, কোনমতে ভিজিটের টাকাটা জুটিয়াছে, ঔষধ আনিবার টাকা জুটিয়া উঠিতেছে না—আজ কয়দিন এমনই করিয়া চলিতেছে, ঔষধ কিনিতে হাতের-পাতের সব ফুরাইয়া গেছে, এখন অনুপায় অবস্থা।

উঠানে গোলায় এখনও ধান আছে, বৎসরের জন্য সঞ্চিত ধান—

অকূলে যেন কূল মিলিল, রঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল।

ধানের খরিদ্দার ঠিক করিতেও বিলম্ব হইল না। রঞ্জন একেবারে খরিদ্দার সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে ফিরিল।

পথে পোষ্টম্যানের সঙ্গে দেখা—"আপনার নামে টাকা আছে বাবু!"

"আমার নামে?"

রঞ্জন যেন আকাশ হইতে পড়িল।

তাহার নামে কেহ যে টাকা পাঠাইতে পারে এ তাহার ধারণায়ও নাই। স্মৃতি-ভাণ্ডারে এমন কাহারও নাম জানা নাই, একদিন না-খাইয়া থাকিলে যে জিজ্ঞাসা করিবে খাওয়া হইয়াছে কি না।

তবু রঞ্জন বলিল, "দেখি, কে পাঠিয়েছে?"

পোষ্টম্যান ফরম্‌খানা বাহির করিল, একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল, "একশো টাকা আসছে, পাঠিয়েছেন—স্বরূপ মিত্র।"

"স্বরূপ মিত্র! একশো টাকা!"

স্বরূপ নামে কাহাকেও সে চিনে না, এ-নাম কখনও সে শুনিয়াছে কি না সন্দেহ। কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটে তাহার পরিচিত কেহ নাই, অথচ টাকা আসিতেছে স্বরূপ মিত্রের কাছ হইতে—বিডন ষ্ট্রীট লেখা আছে।

রঞ্জন মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল—

হাঁ, এ তাহার শ্বশুরবাড়ীরই কারসাজি, তাহাকে কায়দায় ফেলিবার একটা ফন্দি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এরূপ ফন্দি করিবার দরকার কি? তাঁহারা তো বিবাহ অস্বীকার করিয়াছেন।

মন বলিল, তবু এ-একটা চাল।

পোষ্টম্যানকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া সে ফরমের উপর লিখিয়া দিল—মালিক অনুপস্থিত।

বেচারা পোষ্টম্যান থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকা নেবেন না?"

রঞ্জন উত্তর দিল "না, তুমি ফেরৎ দাও।"

ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া পোষ্টম্যান চলিয়া গেল।

খরিদ্দারকে দাঁড় করাইয়া রঞ্জন গোলার চাবি খুলিতেছিল, সেই সময় আসিয়া পড়িল অর্চ্চনা।

পাঁচু মণ্ডলকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াই সে ব্যাপার বুঝিয়াছিল, তবু জিজ্ঞাসা করিল, "গোলার চাবি খুলছো যে রঞ্জুদা?"

রঞ্জন বলিল, "কিছু ধান বার করতে হবে।"

অর্চ্চনা তিরস্কারের সুরে বলিল, "এই বেস্পতিবারে কেউ গোলা থেকে ধান বার করে? তোমার যে কোন জ্ঞান নেই রঞ্জুদা, একেবারে

খৃশ্চান মুসলমানদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছ। তারাও গেরস্তঘরের আইন মেনে চলে কিন্তু তুমি কিছু মানতে চাও না। এই তো পাঁচু মোড়ল রয়েছে, ও-তো জাতে মুসলমান, ওকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, বেস্পতিবারে গোলার ধান বার করে কিনা ?"

ব্যাপার দেখিয়া পাঁচু প্রমাদ গণিল, সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে তো বার করি নে দিদিমণি, কিন্তু বাবু বললেন ব'লেই আসা, নইলে—তা' থাক্ আজ বাবু, কাল সকালে বরং দেখা যাবে।"

রঞ্জন বিবর্ণ হইয়া গিয়া বলিল, "কিন্তু আমার যে আজই দরকার ছিল।"

অর্চ্চনা বলিল, "যে-জন্যে দরকার তা আমি জানি, তোমার সে-ব্যবস্থা করলেই তো হ'লো। তুমি আজ যাও পাঁচু, কালকের কথা কাল হবে, অবস্থা বুঝে আমি তখন ব্যবস্থা করব।"

পাঁচু মণ্ডল চলিয়া গেল।

অর্চ্চনা বলিল, "নাও, গোলার দরজায় চাবি দিয়ে এসো রঞ্জুদা!"

রঞ্জন চাবি বন্ধ করিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল।

অর্চ্চনা অঞ্চল হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া বলিল, "আমারই কি সে-খেয়াল নেই ভেবেছ যে, মাসিমা পয়সার জন্যে ওষুধ পাবেন না ? এই নাও টাকা—চট্ করে গিয়ে ওষুধটা আগে নিয়ে এসো।"

রঞ্জন হাত বাড়াইয়া টাকা লইল, বলিল, "তোমার কাছে যে কত রকমে ঋণী রইলেম অর্চ্চনা, তার ঠিক নেই! ভগবান বাধ্য করেছেন তোমার কাছ থেকে ঋণ নিতে, নইলে বার-বার ভাবছি কিছু নেব না, আবার নিতেই-বা হ'চ্ছে কেন ?"

অর্চ্চনা বলিল, "তোমার পাকা-কথা এখন রাখো রঞ্জুদা, আমি তোমার ও-সব কথা শুনতে চাই নে। শুনব সেইদিন, যেদিন বউদি আসবে, তুমি সংসারী হবে—"

হাসিয়া উঠিয়া রঞ্জন বলিল, "সেই আশা নিয়ে থাকো, কিন্তু জেনো অর্চ্চনা, রাধাও নাচবে না, সাতমন তেলও পুড়বে না। তোমার বউদি কোনদিন এখানে আসছে না, আমার কুটীর তার পায়ের ধূলো পেয়ে পবিত্রও হ'চ্ছে না।"

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "একটা মজার কথা শুনবে অর্চ্চনা ? আমার কোন এক অজানা বন্ধু—তাঁর নামটাও কখনও শুনি নি—কলকাতার বিডন ষ্ট্রীট থেকে একেবারে নগদ একশো টাকা পাঠিয়েছিলেন।"

অর্চ্চনা ঘরের ভিতর যাইতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, "নগদ একশো টাকা ! কি করলে ?"

রঞ্জন বলিল, "ফেরৎ দিলেম।"

অর্চ্চনা অবাক হইয়া তাহার পানে তাকাইল—"ফেরৎ দিলে নগদ একশো টাকা, মানে ?"

রঞ্জন শান্তকণ্ঠে বলিল, "মানে খুব সোজা, আমি বেশ বুঝেছি এ-কাজ কার—আমার বড়লোক শ্বশুরমশাইয়ের।"

অর্চ্চনা বলিল, "কিন্তু এতে তাঁর লাভ কি ?"

রঞ্জন বলিল, "সেটুকু আমিও ঠিক বুঝতে পারছি নে, তবে মনে হয়—বাহাদুরী নেওয়া।"

অর্চ্চনা মাথা দুলাইয়া বলিল, "না, আমার তা' মনে হয় না। আমার মনে হয়, এ-টাকা বেনামী ক'রে বউদি পাঠিয়েছেন।"

রঞ্জন হঠাৎ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার হাসি আর থামে না।

অনেক কষ্টে হাসি থামাইয়া সে বলিল, "তুমি ক্ষেপেছ অৰ্চ্চনা, সে পাঠাবে আমাকে টাকা—এ-কখনও সম্ভব হয়? এই মুহূর্ত্তে যদি তুমি বল জীবন্ত-দেবতার দর্শন লাভ করেছ, তাও আমি বরং মেনে নিতে রাজি আছি, কিন্তু আমার সঙ্গে যার কোন সম্বন্ধ নেই, সে আমাকে টাকা পাঠিয়েছে এ-কথা আমি মানতে রাজি নই।"

সে-টাকা কে পাঠাইয়াছিল সে-কথা চাপা পড়িয়াই রহিল।

*

* *

পুষ্পল ফিরিয়া আসিয়া শুনিতে পাইল, যে-ছেলেটি একদিন তাহাদের গুণ্ডার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, সে অম্লারই স্বামী।

বিস্ময়ে সে নির্ব্বাক হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "বাস্তবিক আমি যদি সেদিন ঘুণাক্ষরেও জানতেম তাহ'লে তোর যা-হোক একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রে যেতেম অম্লা।"

অম্লা একটু হাসিয়া বলিল, "ব্যবস্থা আর কিই-বা হ'তো পুষ্পল, কিছুই হ'তো না—লাভে হ'তে তুই অপমানিত হতিস।"

পুষ্পল বলিল, "সে অপমান আমি গায়েও মাখতেম না। তোর শাশুড়ীর অসুখ ব'লে তোকে নিতে এসেছিল, তুই জোর ক'রে চ'লে গেলেই পারতিস।"

অমুলা বলিল, "তাই কি হয় ?"

পুষ্পল বলিল, "হ'লেই হ'তো। যাক্, একটা কাজ করা যাক্, কিছু টাকা বরং পাঠিয়ে দেওয়া যাক্। অবস্থা তো মোটেই ভালো নয় শুনলেম, রোগীর খরচ-পত্রও আছে তো! কিছু হাতে থাকা ভালো—কি বলিস ? এমনি তো কিছু দেওয়া যায় না, ডাকে পাঠানোই ভালো মনে হয়।"

অমুলা শুধু হাসিয়া বলিল, "দিলেই কি নেবেন ? বিশেষ আমরা পাঠাচ্ছি শুনলেই যে ক্ষেপে যাবেন—যা' অপমান হ'য়ে গেছেন!"

পুষ্পল বলিল, "নাম দেব না, বেনামী ক'রে আমার মামার বাড়ী থেকে পাঠাব, ধরতে পারবেন না।"

অমুলা বলিল, "তাহলেই কি তিনি টাকা নেবেন ? চেনা নেই, জানা নেই—"

পুষ্পল তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "সে ভয় তোকে করতে হবে না অমুলা, আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করছি। একটা প্রবাদ অছে জানিস তো-- 'নেসাসিটি হ্যাজ নো ল'—দরকার পড়লে তখন মানুষ আইন বাঁচিয়ে চলতে পারে না। লোকে চুরি করে কেন বল দেখি ?"

অমুলা বলিল "অনেক সময় অভাবে—আবার সময়-সময় স্বভাবের খাতিরে।"

পুষ্পল বিজ্ঞের মত বলিল, "আমরাও অনেক সময় সে-কথা বলি, কিন্তু সত্যিই কি মানুষ তাই করতে পারে অমুলা ? আমি যখন শুনি কেউ চুরি করেছে কিম্বা কোনও চোরকে চোখে দেখি, তখন সত্যিই আমার বড় কষ্ট হয়—দুঃখ হয়। নিতান্ত অভাব না-পড়লে কেউ চুরি করে না, অভাবই মানুষ গড়ে তোলে, আবার অভাবই চোর ডাকাত

করে। পৃথিবীতে অভাব যদি না থাকতো—চুরি কথাটাও লুপ্ত হ'য়ে যেতো।"

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "আমরা আজ বড়-বড় নজির দিই সে-কালের, তখন দেশে চুরি ছিল না। কথাটা কিন্তু সত্যি নয়, তবে এটুকু বলতে পারি—চুরির বাহুল্য ছিল না। অর্থাৎ সেই পুরাতন যুগে পৃথিবী আজকের মতন সব দিক্ দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায় নি পৃথিবীর বুকে ছিল ধন রত্ন, কেন না সে ছিল নব-যৌবনা—চির-উর্ব্বরা। আজ তার পানে চেয়ে দেখ—বার্দ্ধক্য এসে ক'রে ফেলেছে জরাজীর্ণ, 'আছে' এইটুকু সাড়াই মাত্র দেবে, কিছু দেওয়ার ক্ষমতা আর নেই। কিন্তু শুধু বর্ত্তমান থাকাটাই তো সব কিছু নয় অমুলা, থাকার নিদর্শনটা দেখানো চাই কাজ দিয়ে।"

অমুলা বাধা দিয়া বলিল, "কাজ দিয়ে যথেষ্ট দেখাচ্ছে, দেখ—কত যন্ত্র, কল, কারখানা—"

পুষ্পল বলিল, "হ্যাঁ, তাই একে যান্ত্রিক-যুগই বলতে পারি। মানুষ সোনা ফেলে ছাই কুড়োচ্ছে, একটা অভাব মেটাতে দশটা অভাব বাড়িয়ে তুলছে, কিন্তু সেজন্যে আমি মানুষকে দোষ দিই নে, দোষ দিই অকর্ম্মণ্যা পৃথিবীর। তার আসল রূপ চ'লে গেছে, কৃত্রিমতার সাহায্য নিয়ে সে তবু মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। ভুখা-ভগবান যখন আর্ত্তনাদ করে, তখন চটকদার রং পোষাক ভালো লাগে না, তখন চাই একমুঠো ভাত—সাদা ভাত। উপকরণ না-ই বা রইল, তবু সেই একমুঠো ভাতই দেবে অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি। মানুষ পাচ্ছে কই সেই ভাত? মাঠ অনুর্ব্বর- ফসল কই? দেশে বাড়ছে চুরি ডাকাতি—কিন্তু এর জন্যে

দোষ দেওয়া চলে না। আমি যদি বিচার করতে পেতেম, দেখতে অম্বুলা—চুরির জন্যে শাস্তি দেওয়া একেবারেই উঠিয়ে দিতেম।"

অম্বুলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তাহ'লে একটা দিনও কাউকে বাস করতে হ'তো না পুষ্পল, এখন তবু গৃহস্থ ঘুমোলে চোর অবসর খুঁজে চুরি করে, শাস্তির ভয় না-থাকলে সুযোগ খুঁজে আসবার দরকার হ'তো না। পৃথিবী বৃদ্ধাই হোক আর তরুণীই হোক তাতে আমাদের বিশেষ কিছু আসবে-যাবে না, কারণ আমরা যান্ত্রিক-যুগের মানুষ ; আমরা শুধু অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কোন রকমে বেঁচে থাকব।"

পুষ্পল গম্ভীরভাবে বলিল, "উঁহু, কথাটা অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের এখন ভাববার সময় এসেছে, এ-সব নিয়ে ভাবা উচিত।"

অম্বুলা বলিল, "ভেবে সব-কিছুই হবে, এখন তার চেয়ে সত্যি কাজ কর। টাকাটা কি ক'রে পাঠানো যাবে সেই হ'চ্ছে আসল কথা। কল্পনা নিয়ে খেলা করা চলে, বাস্তবে ওর দাম যে এতটুকুও নেই সে-কথাটা একবার ভাব।"

পুষ্পল সচকিত হইয়া উঠিল—"ঠিক-ঠিক, টাকা পাঠানোর কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেম, কথাটা কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লো। টাকা আজই পাঠাব সেজন্যে ভাবনা নেই, কিন্তু আমি যা' বললেম সেটা উড়িয়ে দেওয়ারও কথা নয়, কল্পনাও নয় সে-কথাটা মনে ক'রো অম্বুলা। আজ আমরা যেখানে এসে পড়েছি, এখানে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে চাইলে দেখতে পাব—"

অম্বুলা বলিল, "দেখব অতীতের কঙ্কাল, আর কিছু নয়। আমি

কিন্তু অতীতের কঙ্কাল নিয়ে নাড়াচাড়া করার পক্ষপাতিনী নই পুষ্পল, ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা গরম করতেও রাজি নই ; যে বর্ত্তমান নিয়ে আমাদের জগৎ, তাকেই চাই নিজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে।"

পুষ্পল বলিল, "তাই সেই বর্ত্তমানই ক'রে ফেললে এমনধারা বিকৃত, যাকে আর কোনমতেই মানিয়ে নিতে পারছো না। আমার যদি তোমার মত উপায় থাকতো, নিজের বর্ত্তমান এবং সুন্দর ভবিষ্যৎ অন্যের হাতে দিতেম না অম্বুলা। নিজের বর্ত্তমান নিজেই তৈরি করতেম এবং ভবিষ্যৎকে ক'রে তুলতেম সুন্দর—মনোরম। কিন্তু না, তোমায় আর কিছু না-বলাই ভালো, হয়ত এখুনি কেঁদে ফেলবে।"

অম্বুলা শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "চোখের জল অত সস্তা নয় যে চোখ ফেটে বার হ'লেই হ'লো।"

পুষ্পল বলিল, "সস্তা বই কি—এ-রকম ক্ষেত্রে সস্তাই হ'য়ে থাকে। আচ্ছা নাও, চল, মনিঅর্ডারটা ক'রে আসা যাক, দেখা যাক ভদ্রলোক নেন কি না।"

অম্বুলা টাকা বাহির করিয়া লইল, বলিল, "চল!"

চলিতে-চলিতে অম্বুলা বলিল, "তোমায় একটা শুভ সংবাদ দিই, ছোড়দা ফিরে আসছে।"

পুষ্পল একটু হাসিয়া বলিল, "শুভ সংবাদ কি না সে-কথা তোমায় ঠিক বলতে পারলেম না। আমার কাছে এ-সংবাদের মূল্য আর নেই তা' তো জানোই—তোমাদের কাছে আছে।"

অম্বুলা বিমর্ষ হইয়া বলিল, "ছোড়দা এলে বাবা তাঁকে নিজের কাছে নেবেন না বলেছেন।"

পুষ্পল বলিল, "হ'তে পারে, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ সাময়িক ব'লেই জানি।"

পোষ্ট-অফিসে গিয়া টাকা মনিঅর্ডার করিয়া উভয়ে ফিরিল।

দুদিন বাদে সে-টাকা যখন পুষ্পলের মামার বাড়ীতে ফেরৎ আসিল, তখন অমলা একটু হাসিয়া বলিল, "দেখলে, অভাবে পড়লেও মানুষের মনুষ্যত্ব অথবা "ডিগ্‌নিটী" যায় না, আমি এই কথাই বলি নি কি ?"

পুষ্পল তাহার মুখের পানে নিঃশব্দে শুধু তাকাইয়া রহিল।

*

* *

অর্চ্চনা আজ সকাল হইতে দেখিতে আসে নাই।

মায়ের জ্বরটা কাল সকালে ছাড়িয়াছে।

শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, উঠিবার ক্ষমতা নাই। রঞ্জন তাঁহাকে পথ্য তৈয়ারি করিয়া খাওয়াইল, ঔষধ দিল।

সকালে একবার বাহিরে কি কাজে যাইবার দরকার ছিল, অর্চ্চনা না-আসায় সে-কাজে যাওয়া হয় নাই।

মাকে খাওয়াইয়া, স্নান করিয়া আসিয়া রঞ্জন উঠানে কাপড় শুকাইতে দিতেছিল, মঙ্গলাদেবী তাহাকে ডাকিলেন।

সে নিকটে আসিলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার খাওয়ার ব্যবস্থা তো করলি রঞ্জু, তোর খাওয়ার ব্যবস্থা কি হ'লো ?"

রঞ্জন মায়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে একটু হাসিয়া বলিল, "সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না মা, আমার খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক আছে। তুমি মনে ভাবো—অর্চ্চনা না-এলে, ভাত না রেঁধে দিলে আমার খাওয়া

হবে না ; তোমার রঞ্জু অত কুড়ে নয় মা, নিজের খাওয়ার জোগাড় নিজে সে করতে পারে।"

মঙ্গলাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করলি ?"

রঞ্জন বলিল, "আজ কিছু করা হয় নি, কাল রাত্রের ভাত আছে, তাই আজ খাব এখন।"

উৎকণ্ঠিতা মা বলিলেন, "বাসি ভাত খাবি রঞ্জু ?"

রঞ্জন বলিল, "কিছু ভেবনা মা, তোমার রঞ্জু শিশু নয়, বাসি ভাত খাওয়া তার বেশ অভ্যেস হ'য়ে গেছে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

রঞ্জন বলিল, "মোটে সময় পেলেম না মা, নইলে কি ভাত রাঁধতে পারতেম না ? এই দেখ না, আজ সকালবেলায় মেঠো-পাড়ায় যাওয়ার কথা ছিল কয়েকটা টাকার জন্যে, তাও হ'য়ে উঠলো না।"

মঙ্গলাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

রঞ্জন বলিল, "তোমায় একা কার কাছে রেখে যাব ? অর্চ্চনা অন্যদিন আসে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাজে যেতে পারি। আজ সে আসে নি, তোমায় এমন অবস্থায় একা ফেলে তো যেতে পারি নে ?"

মঙ্গলাদেবী আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, নিজের কপালে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "পোড়া যম এত লোককে নেয়, আমায় নেয় না। রোজই ভগবানের কাজে প্রার্থনা করছি হয় আমাকে সারাও, নয় আমাকে সরাও, দুইয়ের একটা কর। আর কতদিন এমন ক'রে বিছানায় প'ড়ে থেকে তোর সব দিক নষ্ট করব রঞ্জু ? আমি যে দিনরাত শুধু তাই ভাবছি।"

তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

রঞ্জন ব্যস্ত হইয়া তাঁহার চোখ মুছাইয়া দিতে-দিতে বলিল, "ক্ষেপেছ মা, এর জন্যে তুমি কাঁদতে আরম্ভ করলে? নাঃ, তোমায় নিয়ে আর পারা যায় না। কি এমন হয়েছে যে, একদিন বাসি ভাত খাব বলেছি এতেই তুমি কাঁদলে?"

মঙ্গলাদেবী রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু তুই-ই বল দেখি রঞ্জু, আর কতকাল আমায় এমন ক'রে প'ড়ে থাকতে হবে? নিজের ওঠবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নেই যে এক গেলাস জল গড়িয়ে নেব।"

রঞ্জন বলিল, "তার জন্যে তো কিছু আসছে-যাচ্ছে না মা—"

মঙ্গলাদেবী বলিলেন, "আসছে-যাচ্ছে না তো কি? ঘরের সব জিনিষ-পত্তর নষ্ট হ'য়ে গেল, তুই পুরুষমানুষ আর কত পারবি? আমিই বরাবর এ-সব ক'রে এসেছি, আজ বেঁচে থেকে আমায় এও দেখতে হ'চ্ছে যে—"

রঞ্জন ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "বল কি করতে হবে, আমি তাই করছি।"

মঙ্গলাদেবী বলিলেন, "তুই কি পারবি রঞ্জু? বলবি অর্চ্চনাকে দিয়ে করাবি, কিন্তু সে পরের মেয়ে, পরের বউ, তাকেই বা আমি জোর ক'রে কি বলতে পারি? আমি ভাবছি আমার যা' শরীরের অবস্থা, আমার কিছু হ'লে তুই দাঁড়াবি কোথায়? তোকে দেখবে কে? আজ এগারো বছর অপেক্ষা ক'রে দেখলেম যদি বউমা আসে, কিন্তু সে এলো না, আসবেও না। আমার একটা কথা রঞ্জু—"

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা মা?"

মা একবার দম লইলেন, ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "তুই আবার বিয়ে কর বাবা, তুই সংসারী হ, আমি দেখে চোখ বুজি। নইলে আমি মরণেও শান্তি পাবনা রঞ্জু—"

রঞ্জন নীরব।

মা শীর্ণ হাতখানা তাহার হাতের উপর রাখিয়া ডাকিলেন—"রঞ্জু?"

রঞ্জন উত্তর দিল, "কেন মা?"

মঙ্গলাদেবী বলিলেন, "আমিও ভেবেছিলেম, কিন্তু ভেবে কিছুই হ'লো না। এগারো বছর অপেক্ষা করেছি, অনেক অপমান স'য়েও তোকে এবার শেষ জবাব নিতে পাঠিয়েছিলেম, তাঁরা তোকে জামাই ব'লেও মানতে চান নি! তুই আজও কি সেই কথা মনে ক'রে রাখবি রঞ্জু, যারা তোকে মানতে রাজি নয়, যারা তোকে অপমান করলে—"

মা হাঁপাইতে লাগিলেন—"একটু জল দে রঞ্জু!"

রঞ্জন মায়ের মুখে জল দিল।

মঙ্গলাদেবী বলিতে লাগিলেন, "ভুল আমারই হয়েছিল! অরুন্ধতী যখন বিয়ের কথা বললে, আমি আগু-পিছু না-ভেবে শুধু তার কথা শুনেই বিয়ে দিলেম। সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমার হ'লো না—হবেও না। আমি তোকে এমন ক'রে সংসার-ছাড়া পথের ভিখারী ক'রে যেতে পারব না, আমি যাওয়ার আগে তোকে সংসারী ক'রে যাব। তুই শুধু বল—আমার কথায় রাজি হবি কি না?"

রঞ্জন মৃদুকণ্ঠে কেবল ডাকিল, "মা?"

তাহার মন বলিতেছিল, আবার বিবাহ করা তাহার পক্ষে অনুচিত হইবে।

মঙ্গলাদেবী বলিলেন, "আমার স্বামীর বংশ যে নইলে লোপ হ'য়ে যাবে রঞ্জু, তাঁর পিতৃপুরুষরা একগণ্ডুষ জল পাবেন না—চিরকাল হাহাকার ক'রে বেড়াবেন।

রঞ্জন বলিল, "না মা, আমি বিয়ে করব, তুমি যেদিন—যখন বলবে আমি রাজি রইলেম।"

মা পুত্রের পানে চাহিলেন, তাঁহার চোখ দিয়া ঝর্-ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। রঞ্জন চোখ মুছাইয়া দিতে-দিতে বলিল, "আমি তো রাজি হয়েছি, তবে আবার কাঁদছো কেন মা?"

মা আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "জানি এ খুবই অন্যায় কাজ, কিন্তু উপায়ও তো নেই রঞ্জু! এগারো বছর আমিও অপেক্ষা করেছি, তুইও করেছিস, কিন্তু বউমা তো এলো না—বিয়ের কথাও মানলে না। আজ তোর ভবিষ্যতের পানে চেয়ে এ-কাজ করা ছাড়া আর যে উপায় নেই। তোর পূর্ব্বপুরুষদের আর্ত্তকণ্ঠস্বর আমি শুনতে পেয়েছি। তাঁরা চান বংশধর, তাই আমি আবার তোর বিয়ে দিতে চাচ্ছি। এরপর যেন আমায় দোষ দিস নে বাবা, তুই ভাল ক'রে বুঝে দেখ।"

রঞ্জন রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি বুঝেছি মা, আমিও আমার কর্ত্তব্য ঠিক ক'রে নিয়েছি। প্রথমকার বিয়ের জন্যে তোমায় দোষ দিলেও এ-বিয়ের জন্যে দোষ দেব না, কারণ আমি নিজে দেখে-শুনে বিয়ে করছি।"

মা পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

*

* *

রঞ্জনের বিবাহ সত্যই হইয়া গেল।

সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে, অবস্থা খারাপ বলিয়া একটু বেশী বয়স

হইয়াছে, কিন্তু মঙ্গলাদেবী বেশী বয়সের মেয়েই চান, যে আসিয়াই সংসারের সব-কিছু বুঝিয়া লইতে পারিবে, তাঁহাকে সকল চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিবে।

রমা মেয়েটি বেশ চট্‌পটে, পল্লীগ্রামের মেয়ে বলিয়া অভিজ্ঞতাও বেশী। স্বামীর সম্বন্ধে সব-কিছু জানিয়াই সে স্বামীর আলয়ে পদার্পণ করিল।

শয্যাশায়িনী মা বধূকে বরণ করিতে পারিলেন না, অর্চ্চনা নব-বধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিল।

একসময় রঞ্জনকে নির্জ্জনে পাইয়া অর্চ্চনা বলিল, "বউ বেশ ভালোই হয়েছে রঞ্জুদা, গেরস্তর ঘরে গেরস্তর মেয়েই মানায়, বড়লোকের দুলালী মানায় না।"

রঞ্জন একটু হাসিয়া বলিল, "ভালোই হোক আর মন্দই হোক তাতে আমার কিছু আসবে-যাবে না অর্চ্চনা। গেরস্ত-ঘরের মেয়ে কাজকর্ম্ম করতে পারলেই হ'লো।"

সত্যই রমা কাজকর্ম্মে নিপুণা, একদিনেই সে ঘরের শ্রী ফিরাইয়া আনিল।

রঞ্জন নিশ্চিন্ত হইল, মায়ের ভার দিবার মত সে একজন লোক পাইল।

নূতনত্ব বা বিশেষত্ব রমার মধ্যে কিছুই নাই, সে আর-পাঁচজন মেয়ের মতই মেয়ে, বাংলার বউয়ের মতই বউ।

রঞ্জন স্বপ্ন দেখে অম্বুলার।

সে আসিয়াছিল হঠাৎ, চলিয়া গেল জানাইয়া, অন্তরে রাখিয়া গেল শুধু স্মৃতি।

কিন্তু সে গৃহের গৃহিণী নয়। সে পূজা লইতে জানে, কিছু দিতে জানে না। মানুষ সব দিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না—পাইতেও চায়।

রঞ্জনের অন্তর রহিয়া গেল অপূর্ণ। সে অনেক কিছু পাইবার আশা করিয়াও পায় নাই। আজ সে রমার সহিত অমুলার তুলনা করিয়া দেখে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কতখানি! রমা সারাদিন সংসারের কাজ করে, ঘরের কোথাও অগোছালো কিছু থাকিবার যো নাই, ময়লা জমিবার যো নাই। রঞ্জন নিয়মিত আহার্য্য পায়, সারাদিনের ক্লান্তি-শেষে বাড়ী ফিরিয়া সেবা পায়, শান্তিতে তাহার সারা চিত্ত ভরিয়া উঠে।

তখন কোথায় থাকে অমুলা?

মঙ্গলাদেবীর শরীরের অবস্থা দিন-দিন খারাপ হইয়া পড়ে।

মরণে তাঁহার আর দুঃখ নাই। রঞ্জনকে তিনি সংসারী করিতে পারিয়াছেন। আজ তাঁহার মন সান্ত্বনা পায়, তাঁহার মৃত্যুর পরে রঞ্জন পথে-পথে বেড়াইবে না, সংসারে তাহাকে দেখিবার লোক রহিল।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন রঞ্জনকে অনেক উপদেশ দিয়া, রমাকে সংসার সম্বন্ধে অনেক কিছু উপদেশ দিয়া মঙ্গলাদেবী পরম শান্তিতে চক্ষু মুদিলেন।

রঞ্জন মায়ের মৃত্যুতে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল।

অর্চ্চনা ধমক দিল, "মা তো আর কারও যায় না রঞ্জুদা, তোমারই যেন একলা মা গেছে। পুরুষমানুষ, এমন কত ধাক্কা সইতে হবে তার কিছু বলা যায় কি? দুনিয়ার সকলের পানে চেয়ে দেখ দেখি—ক'জন মা-বাপ নিয়ে বাস করছে? আমি যে এই একা থাকি—কিন্তু চিরদিনই তো

একা ছিলেম না, একদিন আমারও তো মা ছিল। মা গেলেও, আমি মেয়েমানুষ হ'লেও তোমার মত তো হাঁটু-ভেঙ্গে বসে থাকি নি!"

শুষ্ক হাসিয়া রঞ্জন বলিল, "সে-কথা আমিও জানি অর্চ্চনা। এখন মায়ের শ্রাদ্ধের জন্যে কি-কি করতে হবে সেই হয়েছে আমার মস্ত ভাবনা।"

অর্চ্চনা বলিল, "সেজন্যে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না, যা' করবার আমিই করব। তুমি শুধু এক কাজ কর, কলকাতার বউদি'দের একখানা পত্র দাও।"

রঞ্জন বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, তাদের পত্র দেওয়ার মানে?"

রুষ্ট হইয়া অর্চ্চনা বলিল, "তোমার এই সব কথায় সত্যি আমার রাগ হয় রঞ্জুদা। তোমায় যা' বলব তাই ক'রে ফেল দেখি? বউদিকে আসবার জন্যে পত্র দাও।"

রঞ্জন অন্যমনস্কভাবে দূর আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল। এক ঝাঁক বক নীল-আকাশের কোলে সাদা ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়াছিল, রঞ্জন দেখিতে লাগিল তাহাদের সাদা-ডানায় সূর্য্যাস্তের লাল আভা পড়িয়া কেমন চিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, "তুমি কি মনে কর অর্চ্চনা, পত্র লিখলেই সে আসবে? মা মরণের আগে একবার তাকে দেখবার জন্যে কতখানি ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিলেন তা' তুমি জানো?"

অর্চ্চনা বলিল, "জানি, তবু তোমায় একখানা পত্র দিতে হবে রঞ্জুদা, এ-হ'চ্ছে হিন্দুর নিয়ম। অশৌচ যাওয়ার সময় 'দুই ঘাট' করতে নেই, 'এক ঘাটেই' কাজ সারতে হয় এ-কথা তাঁরা জানেন আর লিখলেও বুঝবেন।"

রঞ্জন মাথা নাড়িল—"না, আমার মনে হয় তাঁরা এ ব্যাপারটাকে তেমন ভাবে নেবেন না, নেহাৎ তুচ্ছ ক'রেই উড়িয়ে দেবেন।"

রাগ করিয়া অর্চ্চনা বলিল, "তুমি সে-কথা ঠিক জানো যে তাঁরা তুচ্ছ ক'রে উড়িয়ে দেবেন? তুমি তোমার মত নিয়ে থাকো রঞ্জুদা, আমার মত আলাদা। তুমি যখন আমার মত নিয়েই কাজ করবে ভেবেছ, তখন আমার এই মতটাও নাও।"

রঞ্জন একটা নিশ্বাস ফেলিল।

কি করিয়া সে অর্চ্চনাকে বুঝাইবে তাহার শ্বশুরালয়ের সকলে তাহাকে কতখানি অপমান করিয়াছে! সব কথা সে বলে নাই, বলিতে পারে নাই—বলা যায়ও না।

আজ সে যে-পত্র দিবে, সে-পত্র কেহ দেখিবে না, কেহ পড়িবে না। তাহার মা তাহার নিকট দেবী, কিন্তু তাঁহাদের কে? তাহার মায়ের আত্মার তৃপ্তির জন্য রঞ্জন সবই করিতে পারে, করিবেও, কিন্তু অমুলাদের কাছে সে কেহই নয়। পথ দিয়া কোন মৃতদেহ লইয়া গেলে লোকে যেটুকু সময় সেইদিকে তাকাইয়া ব্যয় করে, অমুলারা তেমনই ভাবে দেখিবে মাত্র। শত-শত মৃতজনের মধ্যে রঞ্জনের মা'ও একজন, তাহার মধ্যে বৈশিষ্ট্য কোথায়?

কিন্তু এত কথা অর্চ্চনাকে বলা চলে না, অমুলাকে সে নিজে যা' খুসি ভাবিতে পারে, মনে-মনে তাহার অতি কঠোর শাস্তি বিধানও করিতে পারে, তবু আর-কাহারও কাছে তাহাকে ছোট করিতে—তাহার নামে কথা শুনিতে রঞ্জন চায় না।

অর্চ্চনা ছাড়িল না, রঞ্জনকে দিয়া সে কলিকাতায় পত্র লিখাইল।

মাত্র দুই ছত্র লেখা—কেবল মায়ের মৃত্যু-সংবাদটা জানানো, সেইটুকু কর্ত্তব্য পালন করিতেই রঞ্জন যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

অর্চ্চনা বলিল, "পত্রটা আমার হাতে দাও। তোমার যে-রকম মনের ভাব দেখছি রঞ্জুদা, তুমি যে ডাকে দেবে তা' মনে হয় না। আমি দিয়ে দেব এখন।"

তাহার হাতে দিয়া রঞ্জন বলিল, "নাও, হ'লো তো, এরপর আর কিন্তু কোন কথা বলতে পারবে না। তুমি লেখালে বটে অর্চ্চনা, কিন্তু এ হ'চ্ছে কেবল যেচে অপমান নেওয়া—ওরা কেউ আসবে না, এ-আমি ঠিক ব'লে দিচ্ছি। অশৌচ নেওয়ার মত শিক্ষা ওদের নেই, কাজেই অশৌচ যাওয়ার ভাবনাও ভাববে না।"

অর্চ্চনা বলিল, "না-আসুক, না-ভাবুক তাতে আমাদেরও কিছু আসবে-যাবে না রঞ্জুদা, এটা হ'চ্ছে আমাদের কর্ত্তব্য। এরপর ওদের যা' ইচ্ছে ওরা তাই করুক, আমাদের তাতে কি?"

অর্চ্চনাই তৎপর হইয়া পুরোহিতকে ডাকাইয়া আনিল এবং কি-কি নিয়ম পালন করিতে হইবে সে-সব বিশেষরূপে জানিয়া লইল।

এ-সমস্ত ব্যাপার হইতে রমা রহিল অতি দূরে, এখানে সে স্বামীর নাগাল পাইল না।

রমা কেবল গৃহের কর্ত্রী, আর কিছু নয়। তাহাতে তাহার দুঃখ নাই, তাহাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে সে তাহা পাইয়াই পরম সন্তুষ্ট।

সে শুধু প্রার্থনা করে তাহার হাতের শাঁখা, লোহা অটুট থাক, তাহার সিঁথার সিঁদুর অক্ষয় হোক। স্বামীর সেবায় সে যেন মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে পারে, স্বামীর সংসারে যেন শান্তি আনিতে পারে। সে অলঙ্কার

চায় না, শাঁখাই তাহার শ্রেষ্ঠ ভূষণ, মূল্যবান শাড়ি চায় না, মোটা লালপাড় শাড়িই থাক তার পরিধেয়।

রমা সারাদিন নীরবে গৃহকর্ম্ম করিয়া যায়, স্বামীর এই দুঃখের উপর সংসারের আর কোন অভাবের কথা বলিয়া বিরক্ত করিতে চায় না।

*

* *

রঞ্জনের পত্র আসিয়া পড়িল অমুলার হাতে।

পত্রখানা হাতে লইয়া সে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার শাশুড়ি—রঞ্জনের মা—

শেষ একবার তাহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার কতটা ব্যগ্রতাই না ছিল। মায়ের আদেশেই রঞ্জন তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল, কিন্তু অমুলা যায় নাই।

সেই রঞ্জন দিয়াছে পত্র—মাত্র দুই-ছত্র লেখা, কিন্তু এই দুই ছত্রেই তাহার অন্তরের ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মন্দভাগ্য রঞ্জন—

হাঁ, সে মন্দভাগ্যই বটে। মাতৃহারা হতভাগ্য, দুনিয়ায় মা ছাড়া তাহার আর কেহই ছিল না। আজ সেই মাকে হারাইয়া সে কি অবস্থায় আছে কে জানে!

অমুলা মানসচক্ষে দেখিতে লাগিল—রঞ্জনের খাওয়া নাই, স্নান নাই, সে অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া আর চিনিবার যো নাই।

মায়া ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, অম্বুলার হাতে পত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কার পত্র অম্বুলা ?"

কথা না-বলিয়া অম্বুলা কার্ডখানা তাহার হাতে দিল।

মায়া পলকের দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বিবর্ণমুখে বলিল, "তোমার শাশুড়ী মারা গেছেন—কিরকম ?"

অম্বুলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তাই তো পড়লেম।"

মায়া কার্ডখানা আস্তে-আস্তে তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "হিন্দুর ঘরে যখন আজও রয়েছ তখন নিয়মগুলো মনে হয় মানা দরকার।"

অম্বুলার মনে ঠিক এই প্রশ্নটাই জাগিতেছিল। সে শুনিয়াছে, গুরুজন কেহ মরিলে অনেক কিছু করিতে হয়, কিন্তু কি যে করিতে হয় তাহা সে জানে না। পুষ্পল এখানে নাই, সে থাকিলে তাহার মায়ের কাছ হইতে অনেক কিছু জানিয়া লওয়া যাইত।

ব্যগ্রভাবে অম্বুলা বলিল, "কি-কি নিয়ম বউদি ?"

মায়া বলিল, "নিয়ম অনেক আছে, কিন্তু সে-সব কি তুমি পারবে ? পারলেও বাবা কি তোমায় করতে দেবেন ? তিনি যখন বিয়ে পর্য্যন্তই মানতে চান না—"

অধৈর্য্য হইয়া অম্বুলা বলিল, "তিনি না-মানলেও আমাকে তো মানতে হবে বউদি ? তিনি বিয়ে স্বীকার না-করুন, আমি স্বীকার করতে পারি আমার বিয়ে হয়েছে—"

বলিতে-বলিতে সে চুপ করিয়া গেল, মনে হইল বড় বেশীরকম বলা হইয়াছে। মায়া এখনই হাসিয়া উঠিবে এবং এ-কথাগুলা এখনই সকলের কাণে তুলিয়া দিবে।

কিন্তু মায়া হাসিল না, বরং তাহার মুখে খুসির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "তোমায় হবিষ্যি করতে হবে অমূলা।"

অমূলা জিজ্ঞাসা করিল, "হবিষ্যি কি?"

মায়া বলিল, "তুমি যদি কর, আমি তোমায় দেখিয়ে দেব এখন। একপাকে যা' হয় নিজে রেঁধে খেতে হবে, কারও ছোঁওয়া খেতে পাবে না, কম্বলে শুতে হবে, বাজারের কোন খাবার খেতে পাবে না—"

অমূলা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "আমি সব করব, তুমি আমায় শুধু দেখিয়ে দিয়ো—ব'লে দিয়ো আর কি-কি করতে হবে।"

পত্রখানা সে ভৃত্যের হাত দিয়া চন্দ্রমোহনের কাছে পাঠাইয়া দিল। চন্দ্রমোহন পত্রের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা বুঝা গেল আহারের সময়। বরাবর চন্দ্রমোহন যখন আহার করিতে বসিতেন, অমূলাও তাঁহার পার্শ্বে আহার করিত। বাল্যকাল হইতে আজও এই নিয়মে সে চলিতেছে।

আজ নিরুপমের সঙ্গে চন্দ্রমোহন যখন আহারে বসিলেন, অমূলাকে দেখা গেল না, তাহার আহারের স্থানও হয় নাই।

চন্দ্রমোহন আহার্য্যে হাত দিয়া হাত উঠাইলেন, বলিলেন, "অমূলা কই বউমা, সে খাবে না?"

নিরুপম উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "তার কি অসুখ করেছে?"

মায়া উত্তর দিল, "না, সে হবিষ্যের জোগাড় করছে, এ-সব খাবে না।"

চন্দ্রমোহন যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—"হবিষ্য! কিসের হবিষ্য! সে হবিষ্য করবে কিরকম?"

মায়া ধীরকণ্ঠে বলিল, "ওর শাশুড়ী মারা গেছেন কিনা, আজ পত্র এসেছে।"

ব্যাকুলভাবে চন্দ্রমোহন বলিলেন, "কই, ডাক দেখি তাকে, দেখি সে কেমন হবিষ্য করছে?"

দাদা গিয়া অম্লাকে ডাকিয়া আনিল। সে তখন সবে স্নান করিয়া উঠিয়া মায়ার নির্দ্দেশমতে স্বহস্তে হবিষ্যের আয়োজন করিতেছিল।

"আমাকে ডাকছেন বাবা?"

চন্দ্রমোহন মুখ তুলিলেন।

উদ্বেগপূর্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোর হ'লো কি অম্লা, তুই খাবি নে?"

অম্লা মাথা নাড়িল, "না বাবা, আমি খাব না, আপনারা খান।"

নিরুপম অধৈর্য্যভাবে বলিল, "খাবি নে কিরকম? জানো, তুমি না বসলে বাবার খাওয়া হয় না?"

অম্লা বলিল, "আমি বসে বাবাকে খাওয়াচ্ছি দাদা!"

সে পিতার পার্শ্বে বসিল।

চন্দ্রমোহন বলিলেন, "তুই খাবি নে?"

অম্লা মাথা নাড়িল, "না বাবা, আমার এখন এ-সব খেতে নেই।"

স্তম্ভিত চন্দ্রমোহন তাহার দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, "মাত্র একটা রাতের দুটো মন্ত্রের জোরেই তারা হ'য়ে গেল তোর এত আপন অম্লা?"

অম্লা একটু হাসিয়া বলিল, "আজ আপনি এত অবুঝের মত কথা বলছেন কেন বাবা? হিন্দুশাস্ত্র তাই বলে না কি, বিয়ের রাত হ'তেই মেয়ে

না, দেখবেন, এই রোগা-হাড়ে আমি যা' ভেল্কী লাগাব, আপনি আপনার ওই চেহারা নিয়ে তার কিছুই পারবেন না।"

রঞ্জন পাশ ছাড়িয়া দিল, চৈতন্য স্নানার্থে ঘাটে চলিল।

এই লোকটাই অর্চ্চনার স্বামী।

বাড়ীতে স্ত্রী আছে, চার-পাঁচটি সন্তান আছে। অর্চ্চনার বিধবা মা বয়স্থা কন্যা লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই, চৈতন্যের স্ত্রী এবং সন্তান আছে জানিয়াও তিনি তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

তিনি দায়মুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে-বোঝা অর্চ্চনার মাথায় চাপাইয়া দিয়া গিয়াছেন তাহার জের টানিয়া, বোঝা বহিয়া অর্চ্চনা পাগল হইয়া উঠিয়াছে। এ-বোঝা নামাইবার স্থান সে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

রঞ্জন চলিতে-চলিতে পিছন ফিরিয়া দেখিল, চৈতন্য জগাবাবুর মালির সহিত বেশ গল্প জুড়িয়াছে। এ-গল্পের জের যে একঘণ্টা বা তার চেয়েও বেশীক্ষণ চলিবে সে জানা কথা।

আজ পাঁচ-ছয় বৎসর গ্রামে যাতায়াত করিয়াও সে ভদ্র-সমাজে স্থান পায় নাই। তাহার পরিচয় গ্রামের অন্ত্যজেরা জানে, ভদ্র-সমাজ জানে না।

রঞ্জন আর দাঁড়াইল না।

*

* *

বেলা বারোটার ট্রেনখানা ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার একটা কামরা হইতে নামিল অমলা, সঙ্গে বিশ্বাসী ও পুরাতন ভৃত্য মণিলাল, বাক্স ও বিছানা লইয়া সেও নামিল।

ছোট ষ্টেশন, নিকটে লোকালয় নাই, দূরে-দূরে গাছের ফাঁকে এক-একটি পর্ণকুটীর দেখা যায়।

অম্বুলাকে দাঁড়-করাইয়া মণিলাল জানিতে গেল, রুদ্রপুর এখান হইতে কতদূর।

ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রুদ্রপুর এখান থেকে অনেকদূর দিদিমণি, ট্যাক্সি করতে হবে।"

অম্বুলা বলিল, "যা' হয় কর, দেরি ক'রোনা।"

ট্যাক্সি ঠিক করিয়া মণিলাল অম্বুলাকে বসাইয়া নিজে ড্রাইভারের পাশে বসিল। গ্রাম্য-পথ দিয়া মোটর ছুটিল।

এ-যেন স্বপ্নের রাজ্য! অম্বুলার মনে হইতেছিল, কবে সে স্বপ্নে যে-দেশ দেখিয়াছিল, আজ সেই স্বপ্নের দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। গ্রাম্য-পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে; সামনের দিকে লতাপাতায় জড়াজড়ি করিয়া যে ঝোপ দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পানে তাকাইয়া মনে হয় পথের শেষ হইয়া গেল। মোটর হঠাৎ বাঁক ফিরিয়া যায়, আবার দেখা যায় দীর্ঘ পথ পড়িয়া আছে। কখনও দেখা যায় পথের দুপাশে ধূ-ধূ করিতেছে মাঠ, কখনও দেখা যায় দুধারে পুষ্পিত আম-বাগান, আমের মুকুলের সুমিষ্ট গন্ধে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। কত পাখীর গান শোনা গেল—কত পাপিয়ার ঝঙ্কার, কত কোকিলের কুহুতান, কত নাম-না-জানা পাখীর অশ্রান্ত কাকলি!

অম্বুলা শুধু চাহিয়াছিল, চোখের পলকও বুঝি পড়ে না। মাঝে-মাঝে গ্রামের ভিতরকার পথ দিয়া চলিতে গৃহস্থ-বধূদের দেখা যায়। পরিষ্কার ঝরঝরে বাড়ী, উঠান, দাওয়ায় হয়ত রন্ধন চলিতেছে, উঠানে

ছেলে-মেয়েরা খেলিয়া বেড়াইতেছে। কত গৃহস্থ-বধূকে কলসী-কক্ষে দেখা গেল, কত গৃহস্থ-বধূকে গৃহকর্ম্মে রত দেখা গেল।

পরিষ্কার উঠানের মাঝে প্রায় প্রতি-বাড়ীতেই ধানের গোলা দেখা গেল, প্রায় প্রতি-বাড়ীতেই ঢেঁকি-ঘর দেখা গেল।

না-আছে শিক্ষার আড়ম্বর, না-আছে সভ্যতার অভিমান। কৃত্রিমতার বালাই নাই—অনাবৃত-গাত্রে শীত-তাপ সহ্য করিতে ইহারা পটু, নাগরিক-সভ্যতা ইহাদের জন্ত করিয়া ছাড়ে নাই। দারুণ গ্রীষ্মে রৌদ্রতাপে, বর্ষার অজস্র বর্ষণে ইহারা মাঠের কাজ করে, ইহারাই জাতির অন্নসংস্থান করে আবার ইহারাই ব্যায়রামে ভোগে, ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে জ্বরাজীর্ণ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কেহ তাহাদের নামও জানে না, নিবাসও জানে না, সেন্সাস-রিপোর্টে মাত্র জানিতে পারে বাংলায় প্রতিবৎসর কত লোক কি ব্যায়রামে মারা যায়।

কতকাল আগে অমূলা এখানে আসিয়াছিল, তখন কি দেখিয়াছিল, কি করিয়াছিল, আজ কিছুই মনে পড়ে না। পিসীমার কথা অল্প-অল্প মনে পড়ে—শান্তমূর্ত্তি একটি বিধবা, মাথার চুলগুলি ছোট-ছোট করিয়া কাটা, পরিধানে থান কাপড়।

তিনি আজ কোথায় কে জানে! জ্যেষ্ঠের নিকট তিরস্কৃতা ও অপমানিতা হইয়া সেই পর্য্যন্ত তিনি আর কোনও সন্ধান দেন নাই, কারও খোঁজও লন নাই।

মোটরখানা হঠাৎ ঝপ্ করিয়া থামিয়া গেল। মণিলাল কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "এই তো রুদ্রপুর গ্রাম, রঞ্জনবাবুর বাড়ী কোনটা বলতে পারেন?"

রঞ্জন আবার বাবু! সে তো চিরকালই রঞ্জন, বাবু-নামে কেহ তাহাকে কোনদিনই ডাকে না, সেইজন্যই বৃদ্ধ হরিচরণ অবাক হইয়া মণিলালের পানে তাকাইয়া রহিল।

বাঁক ফিরিয়া সামনে আসিয়া পড়িল—চৈতন্য।

প্রশ্নটা অল্প একটু কাণে আসিয়াছিল, সে নিজেই উপযাজক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে চান—রঞ্জনবাবুকে ?"

মণিলাল উত্তর দিল, "তাঁর বাড়ীটাকেই উপস্থিত চাচ্ছি।"

একবার মোটরের ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চৈতন্য বলিল, "কোথা থেকে আসা হ'চ্ছে, তাঁকেই বা কি দরকার ?"

অমলা বিরক্ত হইল,"গাড়ী চালাও মণিলাল, দেখে নেওয়া যাবেএখন।"

যেন বাঁশির স্বর—

চৈতন্য একেবারে মোহিত হইয়া গেল, সবিনয়ে মৃদুহাসির সঙ্গে বলিল, "আজ্ঞে না, আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ও-পথে তো গাড়ী যাবে না, তাই এইখানেই গাড়ী রেখে হেঁটে যেতে হবে।"

নামিবে কিনা মণিলাল ইতস্তত করিতে লাগিল। অমলা মুখ-বাড়াইয়া পার্শ্ববর্ত্তী সরু-পথটা দেখিয়া লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল, বলিল, "নামো মণিলাল।"

অতবড় বাক্স ও বিছানাটা মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে মণিলাল ইতস্তত করিতেছিল, কোন কথা বলিবার আগে চৈতন্য নিজেই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বাক্সটা মাথায় তুলিয়া লইল।

অমলা বলিয়া উঠিল, "আপনি রাখুন—আপনি রাখুন। কোন লোক এখানে নেই, পয়সা দিলে যে বাক্সটা নেবে ?"

চৈতন্য দন্তপাটি বিকশিত করিয়া বলিল, "অনর্থক পয়সা খরচ করার কিই-বা দরকার ঠাকরুণ, আমি এমন বোঝা ঢের বইতে পারি, আসুন—"

চলিতে-চলিতে অমুলা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম—কি করা হয় ?"

চৈতন্য উত্তর দিল, "আমার নাম চৈতন্য দাস, কাজকর্ম—তা কিছু-কিছু করি বইকি।"

দরজার কাছেই দেখা গেল—রমাকে। এক কলসী জল লইয়া সে ফিরিতেছিল। সামনে কয়েকজন লোক দেখিয়া সে মুখের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

চৈতন্য বলিল, "এই যে গো, তোমাদের বাড়ীতে এঁরা এসেছেন, বসবার জায়গা-টায়গা দাও।"

রমার কক্ষ হইতে কলসী খসিয়া পড়ে আর কি! এমন বিস্ময়-বোধ জীবনে সে খুবই কম করিয়াছে।

অবগুণ্ঠন ঈষৎ সরাইয়া সে একবার দেখিয়া লইল, তাহাদের পর্ণ-কুটীরে কোন মহীয়সি-মহিলা আজ অতিথি হইয়া আসিল।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের বারাণ্ডায় কলসীটা নামাইয়া রাখিয়া সে বড় ঘরের বারাণ্ডায় একখানা মাদুর বিছাইয়া দিল। চৈতন্য ততক্ষণ বাক্সটাকে নামাইয়া কপালের ঘাম মুছিতে সুরু করিয়াছে।

অবগুণ্ঠনাবৃতা এই মেয়েটির পানে তাকাইয়া অমুলাও বড় কম বিস্মিতা হয় নাই। সে জানিত তাহার স্বামীর সংসারে মা ছাড়া আর কেহই নাই, এ-বধূটি তবে কে ?

তবে কি—তবে কি তাহার স্বামী·—না, সে-কথা ভাবিতেও বুকে কি রকম বেদনা বাজে। কিন্তু হওয়াও তো বিচিত্র নয়, আশ্চর্য্য হইবারও কিছু নাই। বিবাহ না-করাই বরং আশ্চর্য্যের কথা। যদি রঞ্জন বিবাহই করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাকে দোষ দিবার কিছু নাই।

রমা অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়া কৌতূহলপূর্ণ চোখে এই মেয়েটির পানে চাহিয়াছিল। ঘরের বউ সে, অবগুণ্ঠন খুলিয়া কোন কথা বলার শক্তি বা সাহস তাহার নাই, রঞ্জন বাড়ী না-আসা পর্য্যন্ত সে কিছু জানিতেও পারিবে না।

আগামী-কাল শ্রাদ্ধ, রঞ্জন তাই ভোর-বেলাই বাহির হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের নিকট হইতে ফর্দ্দ লইয়া আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র ক্রয় করিতে হইবে। সে এখনও ফিরে নাই, কখন ফিরিবে তাহারও ঠিক নাই।

রমা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে অমুলাও তাহার পিছনে-পিছনে ঘরে গেল।

বেশ বড় ঘরটি, ইহারই মধ্যে বেশ সাজানো। মাটির দেয়াল, চারিদিকে চারটি বড়-বড় জানালা দিয়া ঘরে বেশ আলো-বাতাস আসে। দেয়ালে কয়েকখানা রাধাকৃষ্ণ, কালি, শিবের ছবিও দেখা গেল। একপাশে একটি আল্‌না আছে, তাহার উপরের 'রডে' রঞ্জনের দু'চারখানা জামা-কাপড় ঝুলিতেছে, মাঝেরটিতে কয়েকখানি শাড়িও আছে।

ঘরের আর-একপাশে একখানি ছোট চৌকি পাতা, তাহার উপর উপস্থিত বিছানা, নাই, শ্রাদ্ধের জন্য আনিত তরকারীগুলি রহিয়াছে।

অমুলা এক নিমেষের দৃষ্টিপাতে সবগুলি দেখিয়া লইল। একটা

জলচৌকীর উপর যে দুখানা কম্বল রহিয়াছে, অশৌচের জন্য তাহাই যে বিছানারূপে ব্যবহৃত হয় তাহাও সে বুঝিয়া লইল।

শান্তকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বুঝি এখানেই থাকো?"

রমা অবগুণ্ঠন কমাইয়া মাথা কাত করিল।

সুন্দরী নয়, তবু এমন একটি শান্ত শ্যাম-সৌন্দর্য্য আছে যাহা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়—অমুলাও মুগ্ধ হইল।

বলিল, "রঞ্জনবাবু তোমার কে হন?"

মেয়েটি সলজ্জে মুখ নামাইল।

কলিকাতায় অমুলার ঘরের পাশে যে বধূটি আসিয়াছিল, একদিন অমুলা তাহার স্বামীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে সেও এমনই সলজ্জে মুখ নামাইয়াছিল—প্রশ্নের কোন উত্তর সেদিনও মিলে নাই।

সেদিন অমুলা বোকার মত একই প্রশ্ন বার-বার করিয়াছিল, আজ সে চালাক হইয়াছে তাই আর প্রশ্ন করিল না।

বলিল, "বুঝেছি, তিনি তোমার স্বামী হন। কতদিন হ'লো তোমার বিয়ে হয়েছে?"

রমা উত্তর দিল, "বেশীদিন না, শাশুড়ি মারা যাওয়ার তিন-চারমাস আগে, অগ্রাণ-মাসের প্রথমে।"

অনেক পরে—অমুলাকে আনিতে যাওয়ার অনেক পরে! রঞ্জন অমুলাকে আনিতে গিয়াছিল শ্রাবণ মাসে।

এতদিন সে বিবাহ করে নাই।

কেন—কিসের জন্য?

অমুলা অন্যমনস্কভাবে একখানা ছবির পানে তাকাইয়া রহিল।

রমা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনি কি এখানে থাকবেন ?"

অমুলা চম্‌কাইয়া উঠিল, মুখ ফিরাইয়া দেখিল, "রমা তাহার পানে তাকাইয়া আছে। রমা জানে না সে কে—কেন আসিয়াছে।"

অমুলা বলিল, "থাকব ব'লেই তো এসেছিলেম ভাই, কিন্তু আমায় যে থাকতে দেবে সে-আশা আর নেই। হয়ত দুদিন-বাদেই আমায় ফিরে যেতে হবে, আমার জায়গা আমি হারিয়েছি।"

তাহার কণ্ঠস্বর হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল, রমা কেবল বিস্মিতভাবে তাকাইয়া রহিল।

*

* *

সন্ধ্যার সময় শ্রান্ত-ক্লান্ত রঞ্জন ফিরিয়া আসিল।

অমুলা তখন ঘরের ভিতর, মণিলাল গ্রাম বেড়াইতে গিয়াছে। রমা হবিষ্যের যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল, রঞ্জন ফিরিতেই ভাত বসাইয়া দিল।

রঞ্জন ক্লান্তভাবে দাওয়ায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আজ থাক্‌ রমা, একটা দিন না-খেলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। সারাটা দিন ঘুরে-ঘুরে এখন আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।"

রমা স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "তাই কি হ'তে পারে? কাল কখন কি খেতে পাবে ঠিক নেই, শ্রাদ্ধ ক'রতে হয়ত সন্ধ্যেই হ'য়ে যাবে। আজ

না-খেলে কি শরীর টিঁকবে! তুমি খানিক জিরিয়ে নাও, তারপরে খাওয়া-দাওয়া ক'রো।"

রঞ্জন মাদুরের উপর শুইয়া রহিল।

তাহার অবিন্যস্ত ঘন চুলের মধ্যে হাত বুলাইতে-বুলাইতে রমা বলিল, "আজ একটা মজা হয়েছে জানো? কলকাতা থেকে কে-জানি এসেছেন—"

"কলকাতা থেকে এসেছেন!"

রঞ্জন হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল।

রমা বলিল, "তুমি অমন ক'রে উঠলে যে—শোও।"

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, "কে-কে এসেছেন বললে—ক'জন?"

রমা বলিল, "একটি মেয়ে—চমৎকার দেখতে। হঠাৎ তাঁকে দেখে আমি মনে করেছিলেম যেন জীবন্ত-সরস্বতী নেমে এসেছেন!"

রঞ্জন একমুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিল কে আসিয়াছে।

কয়েকমুহূর্ত্ত সে নীরব হইয়া রহিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায়?"

রমা সামনের বড় ঘরটা দেখাইয়া বলিল, "ওই ঘরে শুয়েছেন। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন, নইলে তোমার সাড়া পেলেই তিনি আসতেন। তোমার কথা লক্ষবার জিজ্ঞাসা করেছেন, সারাদিন না-খাওয়ার জন্যে কত ভাবছেন।"

রঞ্জন বলিল, "তিনি খেয়েছেন?"

রমা বলিল, "তিনি কলকাতা থেকে হবিষ্য ক'রে এসেছেন, এখানে এসে জল ছাড়া আর কিছুই খান নি। রাত্রে খাবেন ব'লে দুধ আর ছানা এনেছিলেন, কিন্তু তিনি কিছু খাবেন না বলেছেন।"

রঞ্জন আবার শুইয়া পড়িল, "বলিল, "কিন্তু আমাদের তো বিছানা নেই রমা, মাত্র দুখানা কম্বল, তাও ময়লা, হয়ত ওঁর গন্ধ লাগবে।"

রমা বলিল, "উনি বিছানা এনেছেন, ওঁর চাকর এসেছে সঙ্গে, সে বেড়াতে গেছে।"

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, "থাকবেন নাকি ?"

রমা বলিল, "থাকবেন ভেবেই নাকি এসেছিলেন, এখন শ্রাদ্ধটা হ'য়ে গেলেই চ'লে যাবেন বলেছেন।"

"হুঁ"—বলিয়া রঞ্জন চুপ করিল।

ঔৎসুক্যের সঙ্গে রমা বলিল, "বলনা উনি কে—দেখে মনে হয় খুব বড়লোকের মেয়ে, অনেক লে জানেন—"

রঞ্জন একটা চাপা-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে-কথা ঠিক, লেখাপড়া উনি অনেক জানেন, খুব বড লোকের একমাত্র মেয়েও বটে।"

রমা বলিল, "তোমার সঙ্গে কি ক'রে চেনা হ'লো, তোমাদের কে হন ?"

রঞ্জন বলিল, "সে-কথা মা জানতেন রমা।"

রমা চুপ করিয়া গেল, ক্লান্ত স্বামীকে আর উত্যক্ত করিবার প্রবৃত্তি তাহার হইল না।

রমা রান্নাঘরে চলিয়া গেল, রঞ্জন উঠিয়া ঘরের দরজায় দাঁড়াইল।

এককোণে একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে, মেঝেয় কম্বল বিছাইয়া শুইয়া আছে অম্বুলা, সে ঘুমায় নাই।

রঞ্জন দরজায় দাঁড়াইতে সে উঠিয়া বসিল, লণ্ঠনের আলো তাহার সুন্দর মুখখানার উপর আসিয়া পড়িল।

রঞ্জন দেখিল, পূর্ব্বে সে যে-অম্বুলাকে দেখিয়াছে এ সে নয়, এ-অম্বুলার সহিত তাহার সম্পূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে। অম্বুলার কাপড়, সিঁথায় উজ্জ্বল সিন্দূর, এমন-কি তাহার হাতের শাঁখা লোহাও রঞ্জনের চোখ এড়াইল না। হাতের কম্বলাসনখানা পাতিয়া রঞ্জন দরজার কাছেই বসিয়া পড়িল।

ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে আমার পত্রখানাই তোমাকে এখানে—এই গ্রামে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এজন্যে আমাকেও দোষ দিয়ো না, আমায় সকলেই বললে তাই লিখেছিলেম। তবে আমি এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেম যে, আমি আসতে লিখলেও তুমি আসবে না।"

তাহার কণ্ঠস্বরে কুণ্ঠিত ভাবটাই ফুটিয়া উঠিল।

অম্বুলা বলিল, "সকলেই তাই ভেবেছিল, সকলের ভাবা মিথ্যে করতেই আমি এসেছি। বাবাও আপত্তি করেন নি, আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

রঞ্জন বলিল, "ক'দিন থাকবে ?"

অম্বুলা উত্তর দিল, "শ্রাদ্ধটা মিটে গেলেই চ'লে যাব।"

রঞ্জন নিস্পৃহভাবে বলিল, "হ্যাঁ, নইলে তোমার ভারি কষ্ট হবে। জন্মাবধি তোমরা কলকাতায় আছ, গ্রামে-আসা জ্ঞানে তোমার এই প্রথম, তার ওপর এই ঘর—খড়ের চাল, মাটীর মেঝে, তোমাদের চাকরেরাও এমন ঘরে থাকতে পারে না, এখানে থাকা তোমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।"

অম্বুলা মুখ নত করিয়া রহিল, একটুপরে মুখ তুলিল।

আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, এখানে থেকে তোমাকে বিব্রত করব না। আমার পরিচয় আমি তোমার স্ত্রীকে দিই নি, দেবও না। দেখলেম

ও-বেচারা কিছু জানে না, ভাবলেম কিছু জানিয়েও দরকার নেই। তোমার জীবন সুখ ও শান্তিময় হোক, আমি কেবল এই প্রার্থনাই করছি।"

"সুখ আর শান্তি—"

রঞ্জনের মুখের উপর দিয়া বিকৃত-হাসির একটা ঢেউ চলিয়া গেল।

"জানো অম্বুলা, জানো, আমার মা কতখানি বেদনা বুকে ব'য়ে গেছেন, জানো, আমি নিজে কতখানি বেদনা সয়েছি? রমা এসেছে, মায়ের আদেশে তাকে আমি নিয়ে এসেছি। তার কাজ সে ক'রে যাচ্ছে, আমার কাজ আমি ক'রে যাচ্ছি; যতটুকু সময় কাছে থাকি ততক্ষণ সে স্ত্রী, আমি স্বামী, কিন্তু একহাত দূরে গেলে আমি তাকে আমার অন্তরে দেখতে পাই নে! আমি জানি আমি তার কাছে দিন-দিন কত অপরাধ করছি, কিন্তু পারলেম না অম্বুলা, কিছুতেই নিজেকে বাধ্য করতে পারলেম না।"

সে দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল।

অম্বুলা মুখ ফিরাইল।

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব।

অম্বুলাই প্রথমে কথা বলিল, "শুনলেম, সমস্ত নাকি বিক্রি ক'রে ফেলেছ?"

রঞ্জন কথাটা বুঝিল না, তাই জিজ্ঞাসু-নেত্রে অম্বুলার পানে তাকাইল।

অম্বুলা বলিল, "জমি-জমা, বাগান সব নাকি অর্দ্ধেক দামে বিক্রি করেছ?"

রঞ্জন বলিল, "এ-খবরটা এসেই পেয়েছ?"

অম্বুলা বলিল, "আমি জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছি। সে-কথা কি সত্যি?"

রঞ্জন বলিল, "সত্যি, এতবড় একটা কথা, মানুষের দেউলে হ'য়ে যাওয়া, এ-কথা কি চাপা থাকে?"

অম্বুলা বলিল, “বাড়ীখানা ?”

রঞ্জন স্মিতহাস্যে উত্তর দিল, “এও পোদ্দারের। তার যখন খুসি সে আমাদের বার ক’রে দিতে পারবে।”

অম্বুলার দুই চোখ ভরিয়া জল আসিয়াছিল, কষ্টে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে বলিল, “বাঁধা না বিক্রি ?”

রঞ্জন বলিল, “সব বিক্রি, বাঁধা কিছুই দিই নি। বাঁধা দিলে সুবিধে হ’তো—না ? একবার যেমন বেনামিতে আমার বড় অভাবের সময় একশো টাকা পাঠিয়ে আমায় গোলামীর বণ্ডে বাঁধতে চেয়েছিলে! কি শুভাদৃষ্ট, বুঝতে পেরে আমি সঙ্গে-সঙ্গে টাকাটা ফেরত পাঠিয়েছিলেম। আজ এ-গুলো বাঁধা আছে জানতে পারলে টাকা দিয়ে সবগুলো খালাস করতে পারতে—না ? ভগবান তোমাদের টাকা দিয়েছেন ন্যায়-অন্যায় কাজে খরচ করতে, আর আমাদের চোখ দিয়েছেন শুধু দেখতে—না ? এতে রাগ করতে পারবে না, আমি সত্যি-কথাই বলছি কিনা বল ?”

অম্বুলার মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছিল, বলিল, “আমি তোমায় টাকা পাঠিয়েছিলেম কি ক’রে জানলে তুমি ?”

রঞ্জন হাসিয়া বলিল, “একি আর জানতে বাকি থাকে ? আচ্ছা, তুমি শোও, আমি খেতে যাচ্ছি, রমা ডাকছে। রাত্রে রমা তোমার এখানে শোবে-এখন, আমি বারাণ্ডায় শুয়ে থাকব। ও-ঘরে তোমাদের চাকরের বিছানা ক’রে দেওয়া হয়েছে, ওর জন্যে ভাবনা নেই।”

অম্বুলা বলিল, “না, ওর জন্যে ভাবছি নে, কিন্তু তুমি বারাণ্ডায় শুয়ে থাকবে—”

বাধা দিয়া রঞ্জন বলিল, "ও আমার অভ্যেস আছে, কতদিন আমরা বারাণ্ডায় শুয়ে রাত কাটাই, আমাদের কিছু হয় না।"

সে বাহির হইয়া গেল, যাইবার সময় দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া গেল।

*

* *

অর্চ্চনার অসুখ।

কপালের সেই ক্ষত সেপ্‌টিক হইয়া গিয়াছে, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। দুই চক্ষু লাল হইয়া রহিয়াছে, অতিকষ্টে চক্ষু মেলিতে পারে। আজ কয়দিন দারুণ জ্বরে সে বেহুঁস অবস্থায় পড়িয়া আছে।

রঞ্জন কালও একবার আসিয়াছিল, আজ সে আসিতে পারে নাই, বাড়ীর কাজে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে।

আজ অর্চ্চনার জ্ঞান ফিরিয়াছে।

ঘরে কেহ নাই, চৈতন্য ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া পিট্‌টান দিয়াছে, অর্চ্চনা তাহা জানে না।

ক্ষীণকণ্ঠে সে ডাকিল, "ওগো, শুনছো ?"

কেহ উত্তর দিল না।

অর্চ্চনা আবার ডাকিল, "আমায় একটু জল দাও, বড় পিপাসা—"

কেহ উত্তর দিল না।

জলের জন্য কতক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া সে আবার চেতনা হারাইয়া ফেলিল।

সন্ধ্যার পর রমা আসিল, রঞ্জন তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

ঘরের দরজা খোলা পড়িয়া আছে, ঘরে আলো জ্বলে নাই। রমা শুনিল অর্চ্চনার ক্ষীণকণ্ঠ—"একটু জল! ওগো, একটু জল!"

"আঃ, অর্চ্চনাদি, জল চাইছো ভাই?"

রমা হাতের লণ্ঠনটা নামাইয়া রাখিয়া, তাড়াতাড়ি কলসী হইতে এক গ্লাস জল গড়াইয়া লইয়া অর্চ্চনার মুখে ঢালিয়া দিতে লাগিল।

একনিশ্বাসে একগ্লাস জল খাইয়া অর্চ্চনা নিশ্বাস ফেলিল—"আঃ, বাঁচালে বৌদি।"

রমা এদিকে-ওদিকে চাহিয়া বলিল, "একলা প'ড়ে আছ অর্চ্চনা'দি, কেউ নেই?"

অর্চ্চনা বড়কষ্টে একটু হাসিল, বলিল, "হয়ত কেউই নেই। কেউ তো থাকে না বউদি, একাই তো থাকি, দেবতা মাঝে-মাঝে পূজো নিতে আসেন, নিয়ে চ'লে যান। সেবার অভাব ঘটলো দেখে দেবতা বুঝি বিমুখ হ'য়ে চ'লে গেছেন।"

রমা আবেগভরে বলিয়া উঠিল, "ঝাঁটা মারি অমন দেবতার মুখে—"

অর্চ্চনা বলিল, "ও-কথা বলতে নেই বউদি, দেবতা—দেবতাই, তাঁর কাজের দোষগুণ বিচার করবার ক্ষমতা আমাদের কই?"

রমা ঝাঁজের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "ক্ষমতা আমাদের আছে বই কি, দোষ গুণ বিচার করবার ক্ষমতা শিশুরও আছে। স্বামী দেবতা এ-কথা সত্যি হ'তে পারে যদি তিনি দেবতার মতই কাজ করেন।"

অর্চ্চনা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হবে, দেবতা হয়ত স্বামী নয়, কিন্তু ভালোবাসাই যে মানুষকে দেবতা করে বউদি। আমার স্বামী,

হয়ত সে চোর, অসচ্চরিত্র, মাতাল, বদমাইস, তবু আমি যে তাকে ভালোবাসি। আমার সেই ভালোবাসাই তাকে দেবতার আসন দিয়েছে।"

রমা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কিন্তু এ-কথা তো সবাই জানে অর্চ্চনা'দি, তোমার স্বামীই তোমায় যে আঘাত দিয়েছে তারই ফলে আজ তুমি শয্যাগত, তোমার সমস্ত শরীরের রক্ত যার ফলে বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে! তোমার স্বামী-দেবতা এই ব্যাপার দেখেই পালিয়েছে, তোমার প্রতি কর্ত্তব্য-পালন করার সময়ও সে পায় নি।"

অর্চ্চনা চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

চুপ করিয়া না-থাকা ছাড়া উপায় কি? অর্চ্চনা জানে তাহার স্বামী কি, সে না-পারে কি! আজ তাহার স্বামীকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই, সত্য তাহার দেহে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে।

রমা ঘরে সন্ধ্যা দিল, আবশ্যকীয় কাজ করিয়া দিল, অর্চ্চনা ততক্ষণ চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিল।

যাইবার সময় রমা আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "অর্চ্চনা'দি?"

অর্চ্চনা চক্ষু মেলিল।

রমা বলিল, "এখন আমি যাচ্ছি, উনি পারেন যদি আসবেন।"

অর্চ্চনা বলিল, "থাক্, আজ রাত্রে আর রঞ্জুদাকে পাঠাতে হবে না, কাল সকালে এলেই চলবে। আজ তুমি যে অত কাজের মধ্যেও একটুখানি সময় ক'রে এখানে এসেছ, এর জন্যে সত্যি আমি তোমায় কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব তা' ভেবে পাচ্ছি নে বউদি। আচ্ছা যাও, অনেক রাত হ'য়ে গেছে।"

রমা বাহির হইল।

চাঁদের আলোয় গ্রাম-বক্ষ তখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, কোথায় কে-জানে একটা পাপিয়া করুণ সুরে চীৎকার করিতেছে—চোখ গেল! চোখ গেল!

রমা যখন নিজের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছাইল তখন শ্রান্ত রঞ্জন বারাণ্ডায় শুইয়া পড়িয়াছে।

শ্রাদ্ধ মিটিয়া গিয়াছে আজই, রঞ্জন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে।

রমাকে দেখিয়া সে মুখ তুলিল—"কি হ'লো রমা, অর্চ্চনাকে কেমন দেখলে?"

রমা হাতের লণ্ঠনটা কমাইয়া বারাণ্ডার একপাশে রাখিয়া দিতে-দিতে বলিল, "খুব জ্বর, মাঝে-মাঝে যখন জ্ঞান হ'চ্ছে কথা বলছে। বেশীর ভাগ সময় ঘুমিয়েই রয়েছে।"

রঞ্জন দুই হাতের কনুইয়ের উপর ভর দিয়া উঠিল—"তার স্বামীটি, সেই চৈতন্য, সে গেল কোথায়?"

রমা বলিল, "সে নেই, পালিয়েছে।"

"পালিয়েছে?"

রঞ্জন একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল।

রমা তিরস্কারের সুরে বলিল, "যাচ্ছো কোথায়? অর্চ্চনাদি' তোমায় আজ যেতে বারণ করেছে, চুপ ক'রে শোও।"

সুবোধ বালকের মত রঞ্জন শুইয়া পড়িল।

বাহিরে অবাধ চাঁদের আলো শুভ্র হইতে শুভ্রতর হইয়া ফুটিতে লাগিল; ঘরের চালায়, গাছের মাথায় সে-আলো চিক্‌চিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। দূরে তখনও পাপিয়া চীৎকার করিতেছে—চোখ গেল! চোখ গেল!

বহুদূর হইতে আর একটি পাপিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছিল, তাহার সুরের রেসটাই মাত্র কাণে আসিতেছিল। আমের মুকুলের সুগন্ধ, উঠানের মাঝখানে প্রস্ফুটিত হেনার সুগন্ধ, বাগানে বাতাবীলেবুর ফুলের গন্ধ মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে, দক্ষিণা বাতাস সেই গন্ধ বহিয়া আনিতেছে।

ঘরের মধ্যে বসিয়া অমুলা—

সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে।

স্বপ্নের ঘোরে ক'টা দিন কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া গেল অমুলা জানে না। এখানে আসিবার পরদিনই সে মণিলালকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছে। বড়লোকের চাকরের বড়মানুষি সে সহ্য করিতে পারে না। মণিলাল যে মুখ টিপিয়া হাসিবে, ফিরিয়া গিয়া এখানকার খুঁটিনাটি একশো কথা লইয়া একলাখ কথার সৃষ্টি করিবে ইহা তাহার অসহ্য।

রঞ্জন ও রমা—

অমুলা অন্ধকার ঘরে বসিয়া চাহিয়াছিল বারাণ্ডার দিকে।

সে কে, কি দাবি লইয়া আসিয়াছে ইহাদের মাঝখানে দাঁড়াইতে! তাহার দাবি থাকিলেও নাই, সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে, সে এখন মৃত।

রঞ্জনকে সে দোষ দিতে পারে না।

দরিদ্র রঞ্জন, ধনীর একমাত্র কন্যাকে নিজের অজ্ঞাতসারে কবে বিবাহ করিয়াছিল আজ তাহা তাহারও মনে নাই। নিজের ক্ষুদ্রতা সব সময়ই তাহার মনে জাগিত তাই সে নিজের দাবি স্থাপন করিতে অগ্রসর হয় নাই, সসঙ্কোচে অনেক পিছনে সরিয়া ছিল। পুত্রের জননীর দাবি লইয়া মাও জোর করিয়া পুত্রবধূকে পাঠাইবার কথা বলেন নাই, অতি সঙ্কোচে ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, অন্ততঃ একটা দিন তাহাকে পাঠাইবার জন্য।

রঞ্জন বিবাহ করিয়াছে তাহারই সম-অবস্থাপন্ন দরিদ্রের কন্যাকে, যে তাহার গৃহে সকল অবস্থাতেই শোভা পাইবে। সে দেবী নয়, সে ধনী-কন্যা নয়, সে মানবী, তাহারই সমপর্য্যায়ভুক্তা। তাহাকে সে আদর করিবে, দোষ হইলে তিরস্কার করিবে, তাহার কাছে মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিবে।

বেদনায় বুক যেন ফাটিয়া যায়। আর্ত্ত-বুকখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া অমুলা বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল—ওগো, আমিও মানবী, দেবী নই, আমি নারী, বাংলারই মেয়ে, এই বাংলারই বউ। দেবতা—আমার দেবতা, তোমার সৃষ্ট স্বর্গে প্রবেশের অধিকার আমায় দিলে না, আমার স্থান নির্দ্দেশ করলে তোমার সীমানার বাইরে গো!

ঘরের ভিতরকার অন্ধকার আরও জমাট হইয়া উঠিল।

*

* *

রমা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উনি জিজ্ঞাসা করছিলেন দিদি, বাবা যে তাঁকে পত্র দিয়েছেন তোমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে—তার উত্তর কি দেবেন?"

অমুলা শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "ওঁকে আর কোন উত্তর দিতে হবে না রমা, আমি আজ বিকেলেই কলকাতায় রওনা হবো ঠিক করেছি।"

রমা যেন আকাশ হইতে পড়িল—"সে কি কথা, আজ বিকেলেই যাবে তা' তো আগে কিছুই বল নি দিদি?"

অমুলা আগের মতই শান্তকণ্ঠে বলিল, "বলার তো কোন দরকারই হবে না ভাই! তোমরা আমায় নেহাৎ লোকাচার রাখতেই একখানা পত্র দিয়েছিলে, বেশই জানতে, আমি আসব না। তবু আমি এসেছি সে-যেমন নিজের ইচ্ছায়, যাওয়াও তেমনি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়, এর জন্যে কাউকে জানানো বা কারও মত নেওয়ার কোন দরকার নেই তো রমা!"

রমা নতনেত্রে নিস্তব্ধে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর যখন মুখ তুলিল, দেখা গেল তাহার দুইটি চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

আর্দ্রকণ্ঠে সে বলিল, "আমি কিছুই জানতেম না দিদি, সেজন্যে আমায় ক্ষমা ক'রো। প্রথমদিন তুমি যখন এলে আমি সেদিন জানতেম না তুমি কে, জানবার প্রবৃত্তিও আমার হয় নি। কি জানি কেন আমার কোন-কিছুর সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানার কৌতূহল কোনদিনই হয় না।"

সে-কথা যে সত্য তাহা অমুলা জানে। প্রথম দর্শনেই অমুলা তাহার পরিচয় পাইয়াছে, কেবল বাহিরের নয়—অন্তরেরও।

অমুলা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর আজও তুমি আমার পরিচয় পাও নি?"

রমা উত্তর দিল, "পেয়েছি। পেয়েছি সেইদিন, যেদিন মা'র শ্রাদ্ধ হ'লো।"—এক-পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে হঠাৎ অমুলার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল, কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমার এতটুকু কষ্ট-দুঃখ হবে না দিদি, তুমি তোমার ঘরেই থাকো, তুমি যেয়োনা। আমি বাপের বাড়ী যেতে পারতেম, কিন্তু সেখানে আমার মা থাকেন মামার বাড়ী, আমি গেলে দুঃখিনী মা আমার ব্যস্ত হ'য়ে পড়বেন তাই আমি সেখানে যাব না। আমায় এখানে থাকতে দিয়ো, আমি তোমাদের সব কাজ করব। কাজ

করবার জন্যেও তো লোকের দরকার হবে দিদি, তুমি তো কিছু পারবে না!”

তাহার হাত-দু'খানা যে বরফের মতই ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল তাহা অম্বুলা বেশ বুঝিতেছিল। সে রমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, সে-দৃষ্টিতে ছিল অসীম বিস্ময়!

এই বাংলার মেয়ে, বাংলার বউ। স্বামীকে ভালোবাসিয়া স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে এই—পুত্রকে ভালোবাসিয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে সেও এই—এই কন্যা, এই স্ত্রী, এই মা।

অম্বুলা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, “তুমি আমায় দিচ্ছো, কিন্তু আমি তো নিতে পারব না বোন্! তুমি যে দিতে চাচ্ছো, এই তোমার অন্তরের প্রকৃত পরিচয়, কিন্তু আমার তো থাকার যো নেই, আমায় যে যেতেই হবে। আমি তো থাকব ব'লে আসি নি, কাজেই গৃহলক্ষ্মী হওয়ার সৌভাগ্য আমার হবে না। আরও একটা কথা কি জানো?”

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া সে বলিল, “আসল কথা, বউ হ'য়ে থাকা আমার দ্বারা হবে না। চিরকাল লেখা-পড়া নিয়ে গেল, বাইরে-বাইরে ঘোরা যার অভ্যেস, সে কি এখন বউ হ'য়ে ঘরে থাকতে পারবে? আরও কথা আছে, ওই-যে পাড়ার মেয়েরা দলে-দলে আসবে আর সমালোচনা করবে, এ-আমি সইতে পারব না—কিছুতেই না।”

রমা বলিল, “লোকের কথার ভয়ে তুমি স্বামীর ঘর করবে না দিদি, এত ভীতু তুমি?”

তার ধিক্কারে অম্বুলার জড়-মন হঠাৎ যেন সচেতন হইয়া উঠিল, সে আবার রমার মুখের পানে তাকাইল।

রমা একটা হাল্‌কা নিশ্বাস ফেলিয়া চাপা-সুরে বলিল, "তোমায় একটা কথা বলি দিদি, উনি যে আমায় বিয়ে করেছেন এ স্বেচ্ছায় নয়, নিজের অনিচ্ছায়—মায়ের ইচ্ছায়। জানো দিদি, এ বিয়েতে উনি একটুও সুখী হন নি, আমি ওঁকে সুখী করতে পারি নি। আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ উনি আমার বিধবা মাকে লোকনিন্দার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, আমাকে রক্ষা করেছেন। আমি ওঁর দাসী হ'য়ে থাকতে চাই। জানি সত্যিকারের স্ত্রী কোনদিন হ'তে পারব না, ওঁর অন্তরে কোনদিন স্থান পাব না। আমার কাজ ওঁকে খাওয়ানো, ওঁর সেবা, করা, এ-ছাড়া আর কিছু নয় দিদি।"

রমা চুপ করিল।

কতখানি বেদনা যে এই নব-পরিণীতার হৃদয়ের তলে লুকাইয়া আছে তাহার কথা হইতেই তাহা জানা যায়। উপর হইতে দেখিয়া বুঝিবার যো নাই, সর্ব্বদা হাসির মুখোসে সে তাহার কান্নার রূপকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

রমা আবার একটা নিশ্বাস লইল, শুষ্ক হাসির রেখা মুখের উপর ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, "আমাকে শুধু কাজ নিয়ে ভুলে থাকতে দাও, আমাকে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে দাও, ছদ্মবেশের আড়ালে আমাকে থাকতে দিয়ো না ভাই-দিদি! আমি চাই ওঁর মুখে সত্যিকার আনন্দের হাসি দেখতে, কিন্তু সে-হাসি ফোটাবার ক্ষমতা তো আমার নেই!"

অমলা তাহার কাঁধের উপর হাতখানা রাখিল, স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "কে বললে নেই? আমি বলছি সে-ক্ষমতা তোমার আছে, প্রত্যেক স্ত্রীরই সে-ক্ষমতা আছে। আমার কথা বলবে বোন্—সত্যি কথা বলব?"

সে একটু ইতস্তত করিল।

রমা বলিল, "তোমার যা' কথা তা' বল ?"

অমলা বলিল, "একটা সত্যি কথা যে আমি কেবল স্ত্রী হওয়ার পক্ষপাতিনী নই। আমার ও তাঁর মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তোমার ক্ষমতা কি রমা, সে-ব্যবধান ঘোচাতে পারো !"

রমা বলিল, "কিন্তু তা' তো হ'তে পারে না দিদি ! পুরাণে পড়েছি, লোপামুদ্রা, সতী, সীতা, বেহুলা —"

অমলা হাসিল, বলিল, "পুরাণ চিরকালই পুরাণ রমা, নূতন-যুগে তার স্থান নেই। ও-সব সতী মেয়েদের কথা ব'লে উপদেশ দেওয়া যেতে পারে মাত্র, কাজে কেউ ও-দৃষ্টান্ত নিতে পারে না। আজ এখানে স্বামীর গৃহলক্ষ্মীরূপে থাকতে গেলে আমায় কতখানি ত্যাগ করতে হবে জানো ? প্রথমেই দেখ—আমি যে একজন গ্র্যাজুয়েট সে-কথাটি ভুলতে হবে, কারণ যিনি আমার স্বামী, তিনি কোনরকমে ম্যাট্রিক পাশই করেছেন মাত্র। আমার কাছে প্রতিপদে তাঁকে পরাজিত হ'তে হবে, এতে তাঁর কষ্ট হ'য়ে উঠবে দুর্ব্বার এবং আমারও মনে জাগবে অহঙ্কার। সেই অহঙ্কারই আমায় বাধা দেবে স্বামীকে ভক্তি করতে, শ্রদ্ধা করতে। ভালোবাসতে হয়ত পারা যায়—লোকে যে মানুষের চেয়ে নিকৃষ্টতম কুকুর-বেড়ালকেও ভালোবাসে, কিন্তু শুধু সেইরকম ভালোবাসাটাই তো স্বামীর কাম্য নয়, স্বামীকে হওয়া চাই সমান অথবা অনেক উঁচু—নীচু হওয়া কখনও নয়। যদি কোন সময় তাঁকে বড় বা সমান ব'লে নাই ভাবতে পারি, শাস্ত্রানুসারে সেটা হবে মহাপাপ এবং স্বামীর কাছেও হবে দারুণ মনস্তাপের বিষয়। কাজেই দরকার নেই তাতে, তার চেয়ে তফাতে থাকাই ভালো। তারপর ধর, কোনদিন তোমার অসুখ হ'লে বা রাগ ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেলে

রেঁধে ভাত খাওয়াতেও পারব না, কলসী নিয়ে পুকুরঘাট থেকে জলও আনতে পারব না, কাজেই আমার আশা ছেড়ে দাও রমা, আমি যেখানে ছিলেম সেখানেই চলে যাই।"

রমা বিস্ময়ে বড়-বড় চোখ দুইটি বিস্ফারিত করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

অমুলা বলিল, "আরও কি জানো ? ছোট-বেলা থেকে আমি এমন শিক্ষা পাই নি যার জন্যে আজ মানতে পারব—স্বামী দেবতা এবং ওঁর তুষ্টির জন্যে আমায় সবই করতে হবে। পুরাণে শুনেছি, গান্ধারীর স্বামী অন্ধ ছিলেন ব'লে তিনি নিজের চোখ সাতপুরু নেকড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন, বেদবতী কুষ্ঠাক্রান্ত স্বামীকে লক্ষহীরার বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিলেন, সীতা বনে যাওয়ার আদেশ না-পেলেও স্বামীর সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন, ও-সব আদর্শ নেবে তোমরা, আমি নেব না—আমার বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষা আমায় বাধা দেবে।"

রমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যে-শিক্ষা মানুষকে পর্য্যন্ত বদলে দেয় সে-শিক্ষালাভ না-করাই ভালো।"

অমুলা বলিল, "তুমি ভুলে যাচ্ছো এটা বিংশ শতাব্দী, আমরা অন্য শতাব্দীতে বাস করছি নে। এ-যুগে প্রথা নেই তাই বিধবার সহমরণ রহিত হয়েছে, বাণপ্রস্থ আর নেই। সোজা কথায় আরও বলি—লোকে আগে যে ধর্ম্মার্থে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দান করতো, আজকাল আর সে-সব প্রথাই নেই। এরই নাম নূতন যুগ—নূতন শিক্ষা।"

বুদ্ধিহীনা রমা কোন কথাই বুঝিল না, কেবল বুঝিল—অমুলা আজ যাইবেই, কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

*
* *

শ্রান্তদেহে দ্বি-প্রহরবেলায় রঞ্জন বাড়ী ফিরিল।

সকালবেলায় সে জমি দেখিতে যায়, প্রত্যহই এমনই সময় ফিরিয়া আসে।

রৌদ্রের তাপ বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে, ফাল্গুন মাসের শেষ সময়।

রঞ্জন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া পড়িল, রমা তাড়াতাড়ি একখানা পাখা আনিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

"আঃ, দাও রমা পাখাখানা আমার হাতে, আমার এত অসুখ হয়েছে, তবু কখনও কাউকে বাতাস করতে দিই নি—সেবা নেওয়া আমার ভারি অসহ্য মনে হয়।"

রঞ্জন রমার হাত হইতে পাখা লইবার জন্য চেষ্টা করিল।

রমা বলিল, "একটু বাতাস করলেই বা, তাতে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে না। মাকে সেবা করতে দাও নি সে সন্তানের কর্ত্তব্য, কিন্তু এখানে তো সে-কর্ত্তব্য নেই, এখানে রয়েছে স্ত্রীর কর্ত্তব্য, আমায় সে-কর্ত্তব্য পালন করতে দাও।"

রঞ্জন একটু হাসিল মাত্র—আর কোন কথা বলিল না।

"রঞ্জু, বাড়ী আছিস নাকি রে?"—বলিতে-বলিতে প্রবেশ করিলেন সম্পর্কীয়া ঠাকুরমা, ও-পাড়ায় থাকেন।

রমা অবগুণ্ঠন টানিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

রঞ্জন উঠিয়া বসিল, বলিল, "এই ফিরছি ঠাকুমা, কোন দরকার আছে?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তা' একটু আছে বইকি। গিয়েছিলেম অর্চ্চনাকে দেখতে, শুনলেম তার অবস্থা নাকি ভারি খারাপ, বাঁচবে কি বাঁচবে না ভগবানই জানেন।"

উৎকণ্ঠিত রঞ্জন বলিল, "আমি কাল তা' তো শুনি নি ঠাকুমা, কাল সন্ধ্যের পরে তো ওকে দেখতে গিয়েছিলেম, বেশ কথা বললে—হাসলে।"

বিজ্ঞের মত হাসিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "ওরে দাদা, বিকারের লক্ষণই ওই—কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও আবল-তাবল বকে, কখনও নিঝুম হ'য়ে ঘুমোয়। ও-সব রোগকে কখনও বিশ্বাস করতে আছে ?"

রঞ্জন ভাবিতেছিল।

ঠাকুরমা বলিলেন "এদিকে হৈ-হৈ কাণ্ড প'ড়ে গেছে কিনা ; আমাদের বিমল পুলিসে খবর দিয়ে এসেছে, চৈতন্য অর্চ্চনাকে মেরে ফেলেছে। পুলিসও এলো ব'লে চৈতন্যকে নিয়ে। এইমাত্র দেখে এলেম একজন দারোগা, দু'জন পুলিস নিয়ে অর্চ্চনার বাড়ী আসছে, গাঁয়ের লোক সবাই তাদের ঘিরে ফেলেছে। ওদের মধ্যে তোকে দেখলেম না কিনা, তাই তোকে খবরটা দিতে এলেম। মণ্ডলদের হ'রে বললে, চৈতন্যকে নাকি পুলিস ধ'রে আনতে গেছে, অর্চ্চনার সামনেই নাকি কি-সব কথাবার্ত্তা হবে। হ'রে বললে, 'থাকোনা ঠাকুমা, বেশ মজা হবে—দেখে যাও।' তা' আমি কি থাকতে পারি বাছা, তোদেরই সামনে না-হয় বার হই, কথা কই, তা' ব'লে আর কারও সামনে বার হ'তে পারি ? বলি, আমারও একটা নাম-ডাক আছে তো ? আমার বাপের বংশকে কে না জানে। ওই-সব পুলিস দারোগার সামনে থাকা—সে কি আমার কাজ ?"

রঞ্জন একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অর্চ্চনার আজ এমন অবস্থা

হইয়াছে তাহা তো সে জানে না, আর পুলিসেই-বা সংবাদ দেওয়া কেন? অর্চ্চনা সেই বদমাইস স্বামীকেই না অত্যন্ত ভালোবাসে, তাহার সকল অত্যাচার নীরবে সহিয়া যায়? সেদিনে রঞ্জন যখন চৈতন্যকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলিয়াছিল তখন অর্চ্চনার মুখখানা কিরকম বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল তাহা রঞ্জন দেখিয়াছিল।

অর্চ্চনাকে সে নিজের ভগিনীর মত ভালোবাসে, পর বলিয়া কোনদিন তাহাকে ভাবে নাই। বাল্যকাল হইতে কত অত্যাচার, কত উপদ্রবই না করিয়াছে, কত ছোট-ছোট কথা আজ কত বড়-বড় হইয়া তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে—অর্চ্চনার জন্যই সে চৈতন্যকে ক্ষমা করিয়াছে।

ঠাকুরমা খবরটা দিয়া বলিলেন, "যাই, আবার সংসারের কাজকর্ম্ম আছে তো! সবেমাত্র স্নান ক'রে এসে রান্না চড়ানোর উদ্যোগ করছিলেম, খবরটা পেয়ে সব ফেলে তাড়াতাড়ি চ'লে এসেছি। ভাবলেম, ছুঁড়িটা চ'লে যাচ্ছে একবার শেষ-দেখাটা ক'রে আসি। গেলেম, ঘরে ঢুকলেম, আমার সঙ্গে একটি কথাও বললে না, শুধু মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ে রইল।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "নাতবউ কোথায় গেলে গো, সেদিন যে দুটো লাউশাক দিতে চেয়েছিলে, হাতজোড়া ছিল ব'লে নিয়ে যেতে পারি নি, আজ দিলে নিয়ে যেতেম।"

রান্নাঘরের খোলার চালে লাউগাছটা লতাইয়া উঠিয়া সমস্ত চাল ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, লাউও ধরিয়াছে বিস্তর।

রমা একখানা দা' লইয়া আসিল, অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল, "একটু বসুন ঠাকুমা, এখুনি কেটে দিচ্ছি।"

ঠাকুরমা বারাণ্ডার ধারে বসিলেন, বলিলেন, "নাতবউ বড় ভালো মেয়ে

রঞ্জু, এমন শান্ত মেয়ে আমি আর একটি দেখি নি। এইত ক'মাস মাত্র বিয়ে হয়েছে, কেউ দেখে বলতে পারবে না নতুন বউ ; যেন কতকালের গিন্নি। বাড়ী-ঘর কি ঝর্‌ঝরে তকৃতকেই না ক'রে রেখেছে। হ্যাঁ, তুই এখুনি যাচ্ছিস নাকি অর্চ্চনাকে দেখতে?"

রঞ্জন শান্তকণ্ঠে বলিল, "যাই, একবার দেখে আসি।"

সে বাহির হইয়া গেল।

রমা কতকগুলি লাউশাক লইয়া আসিয়া বলিল, "এই নিন ঠাকুমা।"

শাকগুলো গুছাইয়া লইতে-লইতে ঠাকুরমা আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বেঁচে থাক দিদি, আমার মাথার যত চুল তত-বছর পরমায়ু হোক, হাতের লোহা ক্ষয় যাক।"

তাঁহার মাথার পানে তাকাইয়া রমা হাসি চাপিতে পারে না। মাথায় কানের দুটি-পাশে মাত্র কয়েকগাছি সাদাচুল—নিদর্শনস্বরূপ এ-কয়গাছি রহিয়া গিয়াছে, বাকি সমস্ত মাথায় চুলের এতটুকু নিদর্শন নাই।

উঠিতে-উঠিতে চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সেই সতীনটা কোথায় গেল, চ'লে গেছে নাকি ?"

রমা বলিল, "না, আজই যাওয়ার কথা বলছেন।"

ঠাকুরমা প্রবল ঘৃণাভরে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "যায় যাক, মানা করিস নে। ওরা সব মেমসাহেবের জাত, এই পাড়াগাঁয়ে খড়ের ঘরে থাকতে পারে—না শুধু-পায়ে হাঁটতে পারে? জানিস নাতবউ, সেবার কলকাতায় গিয়েছিলেম গঙ্গাস্নান করতে, সে যা' দেখলেম তা' আর কি বলব—শুনবি ?" বলিতে-বলিতে আবার তিনি চাপিয়া বসিলেন।

"সেই টেরাম-গাড়ীতে চ'ড়ে কালিঘাটে যাচ্ছিলেম, আমার পাশে কে

জানি এসে বসল, তার পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়তে দেখলেম, পায়ে জুতো। মাগো, কোন পুরুষমানুষ এসে বসলো, গায়ে আবার সেই লম্বা ঝোলা-জামা তাকে কি ওলেষ্টার না লবোষ্টার বলে। ঘোমটার মধ্যে থেকে একটু-খানি মাত্র দেখে আঁতকে উঠে একবারে কোন-ঠেসে বসলেম। খানিক-বাদে বুঝলি নাতবউ, হঠাৎ ভুলে গিয়ে আমাদের ক্যাবলার দিকে চাইতে গিয়ে পাশের লোকটার মুখের দিকে চেয়ে মরেছি, ও-পোড়াকপাল! বিশ্বাস করবিনে নাতবউ, সে একটা মেয়েমানুষ।

রমা বিস্ময়ে বলিল, "গায়ে জামা, পায়ে জুতো—মেয়েমানুষ!"

ঠাকুরমা বলিলেন, "সত্যি তাই—মেয়েমানুষ। আমি তো একেবারে তাজ্জব! কাঁঠালের আমসত্ত্ব নামেই শুনেছি, চোখে কখনও দেখি নি, এই দেখলেম। ওই-যে তোর সতীনটি খালি পায়ে, মাথায় সিঁদূর-কাপড় দিয়ে বউটি হ'য়ে এসেছে না, আমাদের ক্যাবলা বললে, সে নাকি পায়ে জুতোও দেয়, সিঁদূর পরে না, মাথায় কাপড়ও দেয় না। আবার সে নাকি ব্যাটবল খেলে, বই বগলে-নিয়ে ইস্কুলে পড়তে যায়, আবার—বুঝলি নাতবউ, সে নাকি নিজে মটর গাড়ি চালায়।"

রমা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। অমলার এত গুণ আছে, কিন্তু এ-কয়দিনের মধ্যে রমা তো কিছু জানিতে পারে নাই, তাহার স্বামীও তো কিছু বলে নাই। অমলার স্থলপদ্মের মত পা-দুইখানির দিকে চাহিয়া রমার লোভ হইয়াছে বড় কম নয়, সে কারণে-অকারণে কতবার সেই পায়ে হাত বুলাইয়া ধূলা লইয়া মাথায় দিয়াছে। কি চমৎকার পা, কি চমৎকার হাত, রক্ত যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। রমা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই তাহার দিদি হাওয়া-গাড়ী চালায়, ব্যাটবল খেলিতে পারে।

ঠাকুরমা উঠিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে বউ কই—তাকে তো দেখতে পাচ্ছিনে ?"

রমা বলিল, "দিদি বাগানে গেছেন।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "এখনও খাওয়া হয় নি বুঝি ?"

রমা বলিল, "না, ওঁর খাওয়া হ'লে তারপর আমরা দুজনে খাই।"

ঠাকুরমা এই পতিভক্তির নিদর্শন পাইয়া আবার ঠোঁট উল্টাইলেন।

*

* *

অর্চ্চনাকে দেখিয়া রঞ্জন তাড়াতাড়ি করিয়াই ফিরিয়া আসিল। সে জানে তাহার আহার না হইলে রমা তো আহার করিবেই না, অম্বুলাও করিবে না।

স্নানান্তে সে খাইতে বসিল।

রমা জিজ্ঞাসা করিল, "কিরকম দেখলে অর্চ্চনাদি'কে ?"

রঞ্জন বলিল, "আমি একেবারে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে গিয়েছিলেম, তিনি বললেন, এখনও ভয়ের কারণ কিছু নেই। পুলিস এসেছিল বটে, কে-জানি পুলিসে খবর দিয়েছে। চৈতন্যকে ধরেছে এ-টুকু জানি।"

একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া রমা বলিল, "বাবা—বাবা, ঠাকুমা যা' ক'রে ব'লে গেলেন তাতে রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেম। কি মানুষ বাবা, হয়কে নয়, নয়কে হয় করতে ওস্তাদ।"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "যাক, এবার ঘরের কথা বলি, দিদি আজই চ'লে যাচ্ছেন—"

রঞ্জন অত্যন্ত সচকিত হইয়া উঠিল—"চ'লে যাচ্ছেন মানে, কই আগে কিছু বলেন নি তো ?"

রমা বলিল, "না, আমাকে ঘণ্টাখানেক আগে মাত্র বললেন, উনি আজই চলে যাবেন। গাড়ী বলাও হ'য়ে গেছে।"

রঞ্জন নীরবে আহার করিয়া লইল।

অম্বুলা তখন নিজের কয়েকখানা কাপড় জামা গুছাইয়া সুটকেসে তুলিতেছিল, হঠাৎ রঞ্জনকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে-কাজ রাখিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার পানে তাকাইল।

কোনও ভূমিকা না করিয়াই রঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি আজই চ'লে যাচ্ছো ?"

অম্বুলা কাপড়খানা ভাঁজ করিতে-করিতে বলিল, "হ্যাঁ।"

রঞ্জন হঠাৎ আর কোনও প্রশ্নও খুঁজিয়া পায় না; খানিকক্ষণ থামিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এ-রকমভাবে চ'লে যাওয়ার মানে ?"

অম্বুলা মুখ তুলিল, স্থিরদৃষ্টি রঞ্জনের মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "মানে অতি সোজা, আমি যে-কাজের জন্যে এসেছিলেম, সে-কাজ আমার শেষ হ'য়ে গেছে, কাজেই আমি এখন চ'লে যাচ্ছি।"

রঞ্জন নির্ব্বাক।

অম্বুলা বলিল, "তুমি লিখেছিলে, দুই ঘাটে নাকি স্নান করতে নেই,

আলাদা শ্রাদ্ধ করতে নেই, যা' করবার এক জায়গায় করতে হয়, সেই জন্যেই আমি এসেছিলেম, যখন সব মানতেই হবে—"

কেমন যেন বে-ফাঁসেই রঞ্জনের মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, "তাই নাকি, এ-সব তোমরা আবার মানো ?"

অম্লা মুখ ফিরাইল, একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া উত্তর দিল, "তা একটু-আধটু মানতে হয় বইকি। আমি বা আমার দাদারা কেউ এ-সব প্রেজুডিস না-মানলেও আমার বাবা আজও মেনে চলেন।"

রঞ্জনের ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল—"কিন্তু আমি তো তাঁকে কালাপাহাড়-দি-সেকেণ্ড ব'লে জানতেম, অন্ততপক্ষে আমার সামনে তিনি কালাপাহাড়ের সেকেণ্ড-এডিশান ব'লেই নিজেকে ব্যক্ত করেছেন।"

অম্লার দুইটি চোখ একবার জ্বলিয়া উঠিয়া তখনই শান্তভাব ফিরিয়া পাইল, শান্তকণ্ঠে বলিল, "আমার বাবার সম্বন্ধে আমি কোন কথা কারও সঙ্গে বলতে চাই নে—কারণ আমরা ছাড়া আর কেউই তাঁকে চিনবে না, বুঝবে-না। তবে এটা সত্যি কথা, আমরা মানতে না-চাইলেও, আমার বাবা মানেন এবং তিনিই উদ্যোগ ক'রে আমার দাদার মতের বিরুদ্ধেও আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।"

রঞ্জন বলিল, "আবার আজকেই হঠাৎ চ'লে যাওয়ার মানে ?"

অম্লা বলিল, "আমাকে এখনও পড়তে হবে।"

রঞ্জন বলিল, "বি-এ ডিগ্রী তো পেয়েছ।"

অম্লা উত্তর দিল, "কেবলমাত্র বি-এ ডিগ্রী পাওয়াই মানুষের সব নয়, তারপর এম-এ ডিগ্রীও আছে। শিক্ষা মানুষের জীবনভোরই চলে—সীমাবদ্ধ নয়।"

রঞ্জন আর কি বলিবে ঠিক পায় না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু আজ না গেলে কি চলবে না? গরুরগাড়ীতে এতটা পথ যেতেই যে রাত হ'য়ে যাবে, তারপর একমাত্র ট্রেন আছে রাত দশটার সময়ে, প্রায় বারোটায় কলকাতায় পৌঁছোবে।"

অমলা বাক্সের ডালা বন্ধ করিতে-করিতে বলিল, "তা'তেই যাবো।"

রঞ্জন আশ্চর্য্য হইয়া গেল, মেয়ের এতখানি সাহস—বলিল, "কিন্তু তোমাকে একা তো সে-ট্রেনে ছেড়ে দিতে পারি নে, তাহ'লে আমাকেই তোমার সঙ্গে যেতে হয়।"

অমলা বলিল, "তোমার যাওয়ার কোন দরকার দেখছি নে।"

রঞ্জন বলিল, "তুমি দরকার না-দেখলেও আমি দেখছি দরকার আছে, আমি কোনও মেয়েকে রাত্রে একা ছাড়তে পারি নে। হ'তে পারি আমি মূর্খ, পাড়াগাঁয়ের চাষা, তাহ'লেও কর্ত্তব্যহীন নই। তুমি হয়ত কিছু না-বলতে পারো, তোমার বাপ, দাদা এবং সখীরা কি বলবেন না—আমি মূর্খ চাষা ব'লেই একটি মেয়েকে একা রাত্রে পথে ছেড়ে দিয়েছি? তারপরে হয়ত মাসিকে, সাপ্তাহিকে এমন কি দৈনিকেও যখন শহর, পল্লীগ্রামের সভ্যতা ও শিক্ষা সম্বন্ধে বড়-বড় প্রবন্ধগুলো প্রকাশ হবে, তখন জ্বলন্ত প্রমাণ হবে এই ঘটনাটাই। বল অমলা, তুমিই বল, আজও যখন পল্লী-বাসীর অতিথিসেবা আদর্শস্থানীয় হ'য়ে রয়েছে, তখন এত বড় একটা কলঙ্ক স্বেচ্ছায় নেব কি?"

অমলা নীরব হইয়া রহিল।

রঞ্জন বলিল, "কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলে আমি নিজে নাও যেতে পারি, কাউকে দিয়ে তোমায় পাঠিয়ে দেব।"

অমুলা বলিল, "কিন্তু একটা কথা মনে রাখা উচিত, আমি পল্লীগ্রামের সঙ্কোচ-কুণ্ঠার মধ্যে মানুষ হই নি, আমার শিক্ষা আমায় যথেষ্ট শক্তি ও সাহস দিয়েছে।"

রঞ্জন হাসিয়া বলিল, "তা জানি আর এও জানি যে, ও-শক্তি-সাহস কলকাতার মত শহরে কাজে লাগলেও এ-রকম গ্রামে কোনও কাজে আসবে না। শোন অমুলা, এই পাশ্চাত্য-শিক্ষা লাভ ক'রে তোমরা নিজেদের যতটা শক্তিময়ী মনে কর, বাস্তবিক তা' তোমরা নয়। বিলেতের মেয়েরা যা' পারে তোমরা তা' পার না ব'লেই আমার বিশ্বাস। তার মানে কি জানো? ক্ষেত্র সমান উর্ব্বর নয়, আমাদের দেশ তোমাদের মর্য্যাদা আজও সম্পূর্ণরূপে দিতে চায় না। একটি বিদেশী-মেয়ে পথ দিয়ে সগর্ব্বে হেঁটে চলে যেতে পারে, তাকে এ-দেশের লোক সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেবে, একটি অশ্লীল কথা সে-মেয়েটির কাণে যাবে না, কিন্তু তোমরা তার চেয়েও বেশী শিক্ষালাভ ক'রে পথে বার হও, পথে আসবে হাজার বাধা—শুনবে হাজার কথা। ধর, আজ রাত্রে গ্রামের পথে যদি তু'চারজন লোক তোমার গাড়ী ঘিরে দাঁড়ায়, কোথায় থাকবে তোমার শক্তি সাহস, কোথায় থাকবে তোমার শিক্ষা সভ্যতা? কি বোঝে এই সব গ্রাম্য-ছোটলোকেরা মেয়েদের মর্য্যাদা, মেয়েদের শিক্ষা, মেয়েদের প্রগতি? একদিন কলকাতার পথেই তো তার প্রমাণ পেয়েছিলে অমুলা—সেদিন কেউ কি শুনেছিল চীৎকার, কেউ কি দিয়েছিল সাড়া? তবু সে কলকাতা, —শহরের শ্রেষ্ঠ, সে রাজধানী, অগণ্য প্রহরী সেখানে নিয়ত পাহারা দিচ্ছে, তবুও দিনে-তুপুরে সেখানেও চলে নারী-নিগ্রহ, নির্য্যাতন, অত্যাচার তা' তো জানো?"

একটু ভাবিয়া অমুলা বলিল, "কিন্তু কাল সকালেই রওনা হ'তে পারব তো? আমার কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার সময় হ'য়ে গেছে।"

রঞ্জন বলিল, "তোমার উন্নতির পথ আমি বন্ধ করব না অমুলা; তোমার জীবনে আমি মস্ত বড় বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছি, আর বাধা দেব না। এবার তুমি মুক্ত—তোমার জীবনে চলার পথ মুক্ত।

*

* *

অমুলা চলিয়া গিয়াছে।

বাড়ী আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনই রহিয়াছে, তবু মনে হয় সব যেন শূন্য হইয়া গেছে, কে-যেন সব স্থান জুড়িয়াছিল, সে আজ নাই।

রঞ্জন যেমন কাজ করে তেমনই করিয়া যায়, রমা যেমন কাজ করে তেমনই করিয়া যায়।

অর্চ্চনা ভালো হইয়া উঠিয়াছে—কোর্টে মোকর্দ্দমার দিন পড়িয়াছে।

অর্চ্চনা ভাবে—

এ-লাঞ্ছনার চেয়ে মরণই ভালো। কোর্টের নামই সে শুনিয়াছে, ভদ্রমহিলার পক্ষে কোর্টে দাঁড়ানো যে দারুণ অপমানের কথা তাহাও সে জানে, কিন্তু উপায় কই? কিন্তু এ-ও ভালো—যদি সে মরিয়া যাইত?

অর্চ্চনা শিহরিয়া উঠে—

চৈতন্যদাসের হইত দণ্ড, সে-দণ্ডের পরিমাণ বড় কম নয়, হয়ত

আজীবনকালের জন্য তাহাকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হইত। অর্চ্চনা বাঁচিয়াছে শুধু চৈতন্যদাসের জন্যই, নইলে তাহার তো বাঁচিবার আশাই ছিল না।

তবু সে রঞ্জনের কাছে কাঁদিয়া পড়িল—"কি হবে রঞ্জুদা, আমি কি ক'রে আদালতে দাঁড়াব সকলের সামনে, কি ক'রে কথা বলব ?"

রঞ্জন সাহস দিল, বলিল, "তাতে কি হয়েছে, আদালতে না-যায় কে ? তুই তো তবু পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সবারই সামনে বার হোস, কিন্তু এমন অনেক মেয়ে আছে যারা কখনও বাইরে বার হয় না, তারা কি ক'রে আদালতে দাঁড়ায় বল দেখি—আর আমরা তো সবাই থাকব, ভয়টা কিসের ?"

অর্চ্চনা তবুও সাহস পাইল না, বলিল, "গিয়ে কি বলব ?"

রঞ্জন বলিল, "কি আবার বলবি, যা-যা হয়েছে তাই বলবি ?"

অর্চ্চনার মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, সে খানিক নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কিন্তু সে-সব কথা বললে ওকে যে সাজা পেতে হবে, জেলে যেতে হবে।"

রঞ্জন রাগ করিয়া বলিল, "যাক্ না, আমরা সব তো তাই চাই, সে জেলে যাক, সে সাজা পাক। অমন পাষণ্ডের বাইরে ছাড়া-থেকে লোকের অনিষ্ট করার চেয়ে জেলে গিয়ে বিশ্রাম করাই ভালো।"

অর্চ্চনা বলিল, "লোক যদি মন্দ হয় তবে জেলে গিয়েই বা কি হবে রঞ্জুদা, সে তো আবার ফিরে এসে এইরকমই করবে।"

রঞ্জন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এইরকমই করবে যে তার ঠিক কি ?"

অর্চ্চনা বলিল, "না, করবেই যে তার ঠিক নেই, তবে অনেকেই এ-রকম হয় কিনা তাই বলছি।"

রঞ্জন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "তাহ'লে কি বলতে চাও তুমি, চৈতন্যকে শাস্তি দিতে চাও না, তার নির্য্যাতনই সইতে চাও ?"

অর্চ্চনা মাথা নাড়িল, বলিল, "না, তা' চাই নে, আমি চাই মুক্তি পেতে। তোমরা যা' বলবে রঞ্জুদা, আমি তাই করব।"

পরদিন কোর্টে মোকর্দ্দমার তারিখ।

আদালত-গৃহ লোকে-লোকারণ্য, চৈতন্য আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া। তাহার মুখ শুকাইয়া গেছে, নিতান্ত অসহায়ের মতই সে সকলের পানে তাকাইয়া দেখিতেছে।

অর্চ্চনা ফরিয়াদী, ডাক পড়িতে সে কম্পিত-বক্ষে কম্পিত-পদে আসিয়া দাঁড়াইল।

একে-একে সকল সাক্ষীর এজাহার লওয়া হইল, সকলেই একবাক্যে বলিল—আসামী অত্যন্ত বদলোক, মাতাল, চরিত্রভ্রষ্ট। সে প্রায়ই স্ত্রীকে প্রহার করে, স্ত্রীর পিতৃ-প্রদত্ত সম্পত্তি নিজে অধিকার করিতে চায়।

অর্চ্চনাকে জিজ্ঞাসা করা হইল এ-সব কথা সত্য কিনা।

অর্চ্চনা মাথা নাড়িল—"না।"

একমাত্র তাহার কথার উপরই সমস্ত নির্ভর করে—চৈতন্যদাস মুক্তিলাভ করিবে অথবা শাস্তি পাইবে।

আদালতশুদ্ধ লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

হাকিম নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল, আসামী তোমার ওপর অত্যাচার করে নি, ওর প্রহারেই তুমি শয্যাগত হও নি ?"

অর্চ্চনা মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিল, তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। একবার চৈতন্যদাসের শুষ্ক মুখখানার তানে তাকাইয়া ধীরকণ্ঠে

সে বলিল, "না হুজুর, আমার স্বামী আমাকে কোনদিনই মারেন নি। আমি নিজেই একদিন প'ড়ে গিয়েছিলেম, তাতেই আমার মাথায় চোট লেগেছিল আর আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেম। ওঁর কোন দোষ নেই হুজুর, উনি কখনও আমার ওপর অত্যাচার করেন নি।"

সাক্ষীরা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল—অর্চ্চনা বলে কি? আধঘণ্টা আগেও যে বলিয়াছে, চৈতন্যকে এবার সে জব্দ করিবেই—হঠাৎ তাহার এ-পরিবর্ত্তন কি করিয়া হইল।

অর্চ্চনা তখন বলিয়া চলিয়াছে, "ঝগড়াঝাঁটি হয়ত হয় হুজুর, কিন্তু তাই বলে মার-ধর চলে না। ঝগড়াঝাঁটি কোনঘরে না-হয়, তবু তা' নিয়ে তারা বাইরে প্রচার করে না, সব কথা চাপাই থেকে যায়। আমাদের কথা কেমন ক'রে—"

মনের আবেগে সে আরও কত-কি বলিত কিন্তু হাকিম আর কথা বলিতে দিলেন না, ফলে কেস ডিসমিস হইয়া গেল।

মুখের উপর দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া অর্চ্চনা কোর্টের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ম্লানমুখে রঞ্জন বলিল, "ছি-ছি, কি করলি বল দেখি, আমাদের এতগুলি লোকের মুখ-হাসালি, আমরা মুখ দেখাই কি ক'রে?"

অর্চ্চনা শূন্যদৃষ্টিতে শুধু তাকাইয়া রহিল।

চৈতন্যদাস বাহিরে আসিতেই সে গলায় কাপড় জড়াইয়া প্রণামান্তে পায়ের উপর একখানা কাগজ রাখিল। মূর্খ চৈতন্য একটি কথাও বলিতে পারিল না, নিস্তব্ধে শুধু দাঁড়াইয়া রহিল।

মৃদুকণ্ঠে অর্চ্চনা বলিল, "কাগজখানা তুলে নাও, প'ড়ে দেখো। আমি

চ'লে যাচ্ছি, আর কোনদিন যেন আমার গাঁয়ে এসো না আমি থাকতে, তোমার ভালোর জন্মেই এ-কথা বলছি।"

চৈতন্য কাগজ তুলিয়া লইল, ভাঁজ খুলিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ তোমার দানপত্র—উইল, আমাকে সব দিচ্ছো ?"

অর্চ্চনা শান্তকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, তোমাকে সব দিলেম। ইচ্ছে না-থাকলেও শুধু এরই জন্যে তুমি রুদ্রপুরে এসেছ, আমায় বারবার জ্বালাতন করেছ, মুখে আদর-যত্ন করলেও সবই যে ছলনা তা' আমি জানতেম। আজ সে-সবেরই শেষ হ'য়ে যাক, তুমিও নিশ্চিন্ত হও—আমিও নিশ্চিন্ত হই।"

সে ফিরিয়া দাঁড়াইল—

"চল রঞ্জুদা, আমার কাজ আর কথা শেষ হ'য়ে গেছে।"

রঞ্জনের সঙ্গে-সঙ্গে সে বাহির হইয়া গেল, চৈতন্য নিষ্পলকে কেবল তাকাইয়া রহিল।

*

* *

অর্চ্চনা আর ঘরের বাহির হয় না, পথে-ঘাটে তাহাকে দেখা যায় না, বাড়ীতে গেলেও তাহাকে দেখা যায় না। সে যেন লোকচক্ষুর সুমুখ হইতে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

রঞ্জনও আর আসে না।

সে অর্চ্চনার ভালোই করিতে গিয়াছিল, কিন্তু বোকা মেয়েটা যে এমন করিয়া নিজের সব দিক নষ্ট করিয়া ফেলিবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

সে ভাবিয়াছিল, চৈতন্যকে জব্দ করিয়া বশে আনা যাইবে যাহাতে সে আর কোনদিন অর্চ্চনাকে নির্য্যাতন করিতে না-পারে। কিন্তু মূর্খ অর্চ্চনা সব নষ্ট করিল, সে নিজেই ধরা দিল—চৈতন্যকে ধরিতে পারিল না।

রঞ্জন রাগ করিয়াছিল, সেইজন্যই সে কয়দিন অর্চ্চনার বাড়ীর পথেও গেল না। রমা অর্চ্চনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে উদাসভাবে বলিল, "সে ভালোই আছে, তার কিছুই হয় নি। আমার নিজের কাজকর্ম্ম তো আছে, অনর্থক সে-সব না-দেখে অর্চ্চনাকে দেখতে যাওয়া বা গল্প করার অবসর আমার নেই।"

রমা বুঝিতে পারে না কি হইয়াছে, কোর্ট হইতে ফিরিয়া পর্য্যন্ত রঞ্জনের মুখ অন্ধকার হইয়া আছে কেন।

সেদিন রঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া রমা অর্চ্চনার কাছে গেল।

অর্চ্চনা বারাণ্ডায় বসিয়াছিল। আকাশে সেদিন মেঘ করিয়াছে, জলসিক্ত বাতাস ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। সকালে বেশ এক-পসলা বৃষ্টি হইয়া পথ-ঘাট এখনও কর্দ্দমাক্ত হইয়া আছে।

রমা যে-মুহূর্ত্তে অর্চ্চনার বাড়ী পৌঁছাইল, সেই মুহূর্ত্তেই বৃষ্টি নামিয়া আসিল। প্রথমে দুই একটি বড়-বড় ফোঁটা, তাহার পর অজস্র ছোট-বড় ধারা নিমেষে সব একাকার করিয়া দিল।

অর্চ্চনা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এই বৃষ্টি মাথায় ক'রে আসার কি দরকার ছিল বউদি, শুধু-শুধু—"

রমা বলিল, "না, আমি ভিজি নি, বিশ্বাস না-হয় তুমি হাত দিয়ে দেখতে পারো অর্চ্চনা'দি। তারপর, ব্যাপার কি বল দেখি, তোমাকে যে আর মোটে দেখাই যায় না, বাড়ীর বার হওয়া কি ছেড়ে দিলে?"

অর্চ্চনা শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "তাই বটে, এবার থেকে পর্দ্দার বিবি হ'য়ে থাকব মনে করেছি।"

রমা জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে ?"

অর্চ্চনা একটা চাপা-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "খুসি। চিরদিন মানুষ তো একইভাবে জীবন কাটাতে পারে না বউদি, মাঝে-মাঝে একটু বদলাতে হয়, নইলে বড় একঘেয়ে লাগে।"

খানিক চুপ করিয়া সে বৃষ্টিধারার পানে তাকাইয়া রহিল। ঘরের চাল বাহিয়া সহস্র ধারে জল ঝরিতেছিল—কোন ধারাটি মোটা, কোন ধারাটি সরু। ছোট উঠানটি ছাপাইয়া জল ছুটিয়াছে প্রাচীরের সরু নর্দ্দামার পথে।

সামনে একটা আমগাছে একটা কাক বসিয়া ভিজিতেছিল, শত পাতার আচ্ছাদনেও জল বাধা মানে নাই।

অর্চ্চনা বলিল, "আমার ওপর রঞ্জুদা খুব বিরক্ত হয়েছে, না বউদি ? একদিনও তো খোঁজ নিলে না, দেখতে এলো না আমি কেমন আছি।"

রমা বলিল, "কি জানি, তবে সেদিন থেকে মুখখানা অন্ধকার হ'য়ে আছে, তোমার নামও মুখে শুনতে পাই নে।"

অর্চ্চনা মাথা দুলাইয়া বলিল, "ওই তো পুরুষের রাগের লক্ষণ। রাগ হয়েছে আমার ওপর, তোমাকে কি ধ'রে মারবে ?" বলিতে-বলিতে সে হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল, "আচ্ছা বউদি, সত্যি বল—আমার কাজটা কি খারাপ হয়েছে ? আজ সবাই বলছে আমি খুব খারাপ কাজই করেছি, কিন্তু আমার তো মনে হয়, আমি খারাপ কাজ করি নি। রঞ্জুদা সেই রাগে আমার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনে না, এ-পথ দিয়ে পর্য্যন্ত হাঁটে না।"

গভীর দুঃখে সে চুপ করিল।

রমা বলিল, "আমি তো কিছুই জানি নে অর্চ্চনা'দি, কি যে হয়েছে সেদিন তাও তো কেউ আমায় বলে নি।"

অর্চ্চনা বলিল,"আমি ওঁকে বাঁচিয়েছি, বলেছি উনি আমায় মারেন নি।"

সরলা রমা বলিল, "এ-কথা তো বেশই হয়েছে। সত্যি তিনি জেলে যাবেন, তুমিই তাঁকে জেলে দেওয়ার কারণ হবে, এ-কথনও হ'তে পারে না। এ-তো তুমি বেশ ভালো কাজই করেছ অর্চ্চনা'দি।"

অর্চ্চনা বলিল, "তারপর—যা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ, যা' নিয়ে মারামারি-কাটাকাটি তারও গোড়া শেষ করেছি। আমার যা-কিছু জমি-জমা আছে সব তাঁকে লেখাপড়া ক'রে দিয়েছি।"

রমা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "এটাতে আমি কিন্তু মত দিতে পারলেম না অর্চ্চনা'দি, আমার মনে হয় এ-কাজ তোমার ভালো হয় নি। এরপর যদি তিনি তোমায় বার ক'রে দেন তখন দাঁড়াবে কোথায় ?"

অর্চ্চনা বলিল, "দাঁড়াবার জায়গা আবার কোথাও ক'রে নিতে হবে। ধর, তোমার ওখানেও যদি যাই, তুমি কি আমায় আশ্রয় দেবে না বউদি ?"

রমা হাসিল, বড় মলিন হাসি—

বলিল, "আশ্রয়—কিন্তু আমাদেরই যে আশ্রয় নেই অর্চ্চনা'দি ! মায়ের শ্রাদ্ধের সময় জমা-জমি, বাড়ী সবই তো বন্ধক দেওয়া হয়েছে। তারা এখন টাকা চাচ্ছে, বলছে, যদি টাকা না পায় সব বিক্রি ক'রে নেবে।"

অর্চ্চনা কেবলমাত্র বলিল, "হুঁ।"

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব।

রমা বলিল, "বৃষ্টি ক'মে এসেছে, আমি এবার যাই অর্চ্চনাদি, ঘাটে জল নিতে এসেছিলেম।"

অর্চ্চনা কেবলমাত্র বলিল, "তুমি যে এসেছ, রঞ্জুদা এ-কথা জানে ?"

রমা বলিল, "তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি আসতে বলেছেন।"

বৃষ্টি কমিয়াছিল মাত্র, একেবারে ধরে নাই। অর্চ্চনা বলিল, "এতখানি পথ যেতে একেবারে ভিজে যাবে বউদি, আর-খানিক বসলে আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে যেতো।"

আকাশের পূর্বদিক হইতে যে নিকষ-কালো একখানা মেঘ অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেকখানি করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, সেইটা দেখাইয়া রমা বলিল, "আর নয়, ওই মেঘখানা এসে পড়লে আর সহজে বৃষ্টি ধরবে না। এইবেলা যাওয়া যাক, ওদিকে আবার কাজ তো আছে!"

সে বাহির হইল।

পথ দিয়া জলস্রোত চলিয়াছে। অতি সন্তর্পণে রমা চলিতেছিল—যেন পড়িয়া না-যায়। একটা বাঁক ফিরিতেই সে যে-লোকটির সামনে আসিয়া পড়িল সে চৈতন্য ছাড়া আর কেহ নয়। একটা ছাতা-মাথায়, হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া একখানা গামছায় কাপড় জড়াইয়া চৈতন্য আসিতেছে—সম্ভব অর্চ্চনার নিকটেই।

সামনে রমাকে দেখিয়াই সে দাঁড়াইল—

"হ্যাঁ হ্যাঁ—বউদি যে, ভালো আছেন তো ? রঞ্জুদা ভালো আছেন ?"

রমা অবগুণ্ঠন টানিয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

চৈতন্য সবিনয়ে বলিল, "আবার এলেম বউদি, জিনিসপত্রগুলো বুঝে-সুঝে নিতে হবে তো, আপনার ননদ যে সব দানপত্র ক'রে দিয়ে এসেছে তা' তো শুনেছেন। আমি ওকে বলছি এখানকার সব বিক্রি ক'রে আমার ওখানে চল। এবার তো আর 'না' বলার যো-নেই—যেতেই হবে।"

রমা সোজা অগ্রসর হইল।

চৈতন্য ডাকিয়া বলিল, "রঞ্জুদাকে বলবেন—আমি এসেছি, একবার যেন দেখা করেন।"

ততক্ষণে রমা আর একটা বাঁকের আড়ালে মিলাইয়া গেছে।

*

* *

দিনের পর দিন যায়—

অমুলা সিক্সথ্-ইয়ারে পড়ে। পুষ্পল মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে, বিধবা মা তাহার বিবাহ দিবার আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

আজও সে অমুলার কাছে আসে। আগেকার মত প্রত্যহ আসিতে পারে না, তথাপি না-আসিয়াও থাকিতে পারে না।

অনুপম বিলাত হইতে ফিরিয়াছে, সঙ্গে তাহার স্ত্রী জনৈক ইংরাজ মহিলা। বালিগঞ্জে বাসা হইয়াছে, শীঘ্রই কাজে যাইবে।

সম্প্রতি চন্দ্রমোহনের কঠিন ব্যায়রাম হওয়ায় অনুপমকে প্রত্যহই আসা-যাওয়া করিতে হইতেছে, তাহার স্ত্রী কোনদিন আসে—কোনদিন আসে না।

অমুলা কলেজ কামাই করিয়া পিতার পার্শ্বে রহিয়াছে, মায়ারও একমুহূর্ত্ত অবকাশ নাই। নার্শ থাকা সত্ত্বেও মায়া ও অমুলা চন্দ্রমোহনের নিকটেই থাকে, চন্দ্রমোহন তাহাদের চোখের আড়াল করিতে পারেন না।

নিরুপম পিতার ঘরে আসিতে পারে না। সে অত্যন্ত হাল্‌কা-প্রকৃতির

লোক, অল্পতেই অধীর হইয়া উঠে, সামান্য কিছু হইলে কল্পনায় সে অনেক বড় বলিয়া ধরিয়া লয় এবং উৎকণ্ঠিতও হয় বড় কম নয়। পিতার ঘরে সে প্রবেশ করিতে পারে না, বাহিরে ছুটাছুটি করে।

পাঁচদিন পরে চন্দ্রমোহনের জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাই যে শেষ জ্ঞানলাভ তাহা সকলেই জানিত—চন্দ্রমোহন নিজেও তাহা বুঝিতেছিলেন। চক্ষু মেলিয়া তিনি ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন, "অনু—অনুলা ?"

অনুলা পিতার পার্শ্বেই ছিল, পিতার আহ্বানে সরিয়া আসিয়া তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "ডাকছেন বাবা ? এই যে আমি আপনার কাছেই আছি।"

কম্পিত হাতখানা অনুলার হাতের উপর আস্তে-আস্তে রাখিয়া চন্দ্রমোহন বলিলেন, "আমি আর বাঁচব না মা, ওরা সবাই এসেছে তো— অনু, নিরু, বউমা ?"

চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে চায়, অতি সন্তর্পণে সে-জল চাপিয়া রাখিয়া অনুলা বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "সবাই এসেছেন বাবা—বড়দা, ছোড়দা, বড় বউদি সবাই তোমার এখানেই আছেন।"

কম্পিতকণ্ঠে চন্দ্রমোহন বলিলেন, "ওদের আমার কাছে আসতে বল অনুলা, আমি সকলকে একবার দেখে নিই।"

পুত্র দুইটির মধ্যে একটি উপস্থিত, নিরুপম পাশের ঘরে অস্থিরভাবে পাদচারণ করিতেছে। পিতা ডাকিতেছেন শুনিয়া সে দরজার উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রমোহন ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "আমি বাঁচব না তা' আমি জানি, তোমরাও জানো। আমি যে যাচ্ছি সেজন্যে আমার দুঃখ নেই বরং

আনন্দই হ'চ্ছে। তোমাদের কারও জন্যে আমি ভাবছি নে, আমার একমাত্র ভাবনা কেবল অম্বুলার জন্যে, কেবল অম্বুলা—"

তিনি চক্ষু মুদিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

নিরুপম কি বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না, কেবল কাঁদিয়াই ভাসাইয়া দিল। অনুপম বলিল, "আমরা যতক্ষণ আছি বাবা, অম্বুলার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। তা'ছাড়া ও যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছে, কারও গলগ্রহ হ'য়ে ওকে যে থাকতে হবে না তা-তো আপনি জানেন।"

চন্দ্রমোহনের মুখের উপর মৃদুহাসির একটু রেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "তা আমি জানি, কিন্তু এ-দেশের মেয়েরা যতই লেখাপড়া শিখুক, আমার মনে হয়, স্বাতন্ত্র্য থাকা তাদের পক্ষে ভালো হবে না—আত্মীয়স্বজনের মাঝখানে তাদেরই একজন হ'য়ে থাকা ভালো। অম্বুলাকে আমি স্বাতন্ত্র্য শিক্ষা দিই নি, আমি—"

তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে রুদ্ধকণ্ঠে মায়া বলিল, "আপনার বউমা তো এখনও মরে নি বাবা, আপনি নিশ্চিন্ত হোন, অম্বুলা আমার কাছেই থাকবে।"

"মা—বউমা!" চন্দ্রমোহনের চোখ দিয়া অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল।

অম্বুলার হাতখানা তাঁহার বুকের উপর ছিল, সেই হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন, "তাই থাকিস মা, বউমার কাছেই থাকবি। তারপর—তারপর যদি কোনদিন না-থাকতে পারিস্ তুই, চ'লে যাস পুষ্পলের কাছে। সে আমায় বলেছে—সে আমায় অনেক আগে হ'তে ব'লে রেখেছে।"

বলিতে-বলিতে তিনি চোখ চাহিলেন—"পুষ্পল এসেছে?"

অমুলা চোখ মুছিয়া উত্তর দিল, "তাকে ডাকতে পাঠিয়েছি বাবা, এখুনি আসবে।"

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া চন্দ্রমোহন বলিলেন, "বউমা, অন্থু, নিরু, তোমরা একটু বাইরে যাও, অমুলার সঙ্গে আমি একটা কথা বলব।"

সকলেই বাহিরে গেল, রহিল শুধু অমুলা। পিতা যে কি বলিবেন তাহা আন্দাজেই বুঝিয়া অমুলা বিবর্ণ হইয়া গেল।

তাহার হাতে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে চন্দ্রমোহন বলিলেন, "রুদ্রপুরে পত্র দিয়েছিলি কি মা—আমি যে পত্র দিতে বলেছিলেম?"

অমুলা মুখ ফিরাইয়া কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিল, "না বাবা, দিই নি।"

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

অমুলা পিতার মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "দিই নি তার কারণ—সে আপনাকে তো এতটুকু শ্রদ্ধার চোখে দেখে না বাবা! আপনি আমার বাবা, কিন্তু তার কাছে এতটুকু শ্রদ্ধা বা সম্মান আপনি পাবেন না, আমার বাবাকে আমি এত ছোট করতে পারব না বাবা—আমায় মাপ করুন।"

"পাগল মেয়ে—"

পিতার মৃত্যুমলিন মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল—"ওরে, কেবল আমার দিকটাই আজীবনকাল দেখে গেলি, আমার জিদ রাখতে নিজের সুখ, সাধ, আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জ্জন দিলি? নিজেকে এমনভাবে বিলিয়ে দিলি মা, এতটুকু নিজের জন্যে রাখলি নি?"

অমুলা নীরবে পিতার বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

চন্দ্রমোহন আদ্র'কণ্ঠে বলিলেন, "নিজের স্বার্থের পানে তাকিয়ে

তোর বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ অন্ধকার করেছি; তোর অতীতটাই শুধু জীবন্ত হ'য়ে রইল মা! এরপর যেদিন নিজের পানে চোখ পড়বে, সেদিন আমায় ধিক্কার তোকে দিতেই হবে অম্বুলা, আজ কিছু মনে না করলেও সেদিন তুই আমাকে তোর সকল সুখ-শান্তিহারক ব'লে অভিশাপ দিবি।"

অম্বুলা বলিতে গেল, "না বাবা, আমি তা'—"

চন্দ্রমোহন বাধা দিলেন—"ওরে, তা' আমি জানি। আমি জানি তোর মনে নিজের অজ্ঞাতসারে সে-কথা জাগলেও তুই তাকে আমল দিবি নে, তুই তাকে গলা টিপে মারবি। কিন্তু সে-যে সত্য—সে-যে পরম সত্য মা!"

তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন।

অম্বুলা আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "আপনি চুপ করুন বাবা, ও-সব কথা আর তুলবেন না, আর মনেও করবেন না।"

ক্লান্তকণ্ঠে চন্দ্রমোহন বলিলেন, "এই আমি চুপ করলেম মা, আর ও-সব কথা তুলব না—তবে তোকে আমি কারও গলগ্রহ ক'রে গেলেম না। আমার কলেজ-ষ্ট্রীটের বাড়ী আর কিছু টাকা তোর নামে উইল ক'রে দিয়েছি, তোর জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে।"

আস্তে-আস্তে পরদা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল—পুষ্পল।

উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছেন, অম্বুলা?"

অম্বুলা উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার মুখের ভাবই সে-কথা প্রকাশ করিয়া দিল। পুষ্পল রোগীর হাতখানা তুলিয়া পরীক্ষা করিল, তাহার মুখখানা অন্ধকার হইয়া গেল।

চন্দ্রমোহন একটু হাসিয়া বলিলেন, "আর দেখবার কোন দরকার নেই

মা, আমি এখন সকল দেখার বাইরে। বুড়ো-হাড় মা, নিজের অবস্থা নিজেই বেশ বুঝতে পারছি।"

তিনি অম্লার হাতখানা বুকের উপর ধরিয়া রাখিয়া চোখ মুদিলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় চন্দ্রমোহন ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

অম্লা পিতার মাথার শিয়রে তখনও আড়ষ্টভাবে বসিয়া—পুষ্পল নীরবে চোখ মুছিতে লাগিল।

*

* *

রমা রাশীকৃত ময়লা কাপড়-জামা একটা হাঁড়িতে করিয়া সিদ্ধ করিতে বসাইয়াছিল—দুপুরে ঘাটে গিয়া এগুলি কাচিয়া আনিবে এই ছিল তাহার মতলব। রঞ্জন সেদিন বাহির হয় নাই, ঘরেই একটা মাদুরের উপর শুইয়া বহুকালের একখানা রামায়ণের পাতা উল্টাইতেছিল।

পোদ্দার টাকার জন্য তাড়া দিতেছে, আজই সকালে সে বলিয়া গিয়াছে, টাকাটা তাহার খুব শীঘ্রই পাওয়া চাই। রঞ্জন মায়ের শ্রাদ্ধ করিবার সময় লেখাপড়া করিয়া দিয়াছে একবৎসরের মধ্যে টাকা শোধ করিয়া দিবে। একবৎসর শেষ হইয়া গেল, পোদ্দারের চলতি টাকা সে আর রাখিতে পারে না।

অম্লাকে সে বলিয়াছিল সব বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে, পোদ্দারের কাছে সমস্ত বন্ধক রহিয়াছে। অম্লার দান সে লইতে চায় না, সারামন সে-কল্পনায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে।

সকালে ও-পাড়ার পরেশ আসিয়াছিল, তাহার মুখে খবর পাওয়া

গেছে—চন্দ্রমোহন মারা গিয়াছেন, অমূলা একখানা বাড়ী ও অনেক টাকা পাইয়াছে।

ব্যগ্র হইয়া রমা বলিয়াছিল, "তুমি একবার কলকাতায় যাও, এ-সময় যাওয়া উচিত।"

রঞ্জন ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিয়াছিল, "কেন যাওয়া উচিত—সে সম্পত্তি পেয়েছে ব'লে?"

ব্যথিত হইয়া রমা বলিয়াছিল, "সেজন্যে নয়। মা মারা যাওয়ার খবর পেতেই দিদি এসেছিলেন, তোমারও সেইজন্যে যাওয়া উচিত।"

সেজন্য যাওয়া উচিত রঞ্জনও তাহা জানে, কিন্তু যাওয়ার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল অমূলার টাকা ও বাড়ী। লোকে বলিবে, অমূলা এইগুলি পাইয়াছে বলিয়াই রঞ্জন আসিয়াছে, এ-কথা রঞ্জন সহিতে পারিবে না। হয়ত অমূলাও এ-কথা মনে করিবে, রঞ্জন সে-অবকাশ তাহাকে দিবে না।

রমাকেও সে-সব কথা জানিবার অবকাশ সে দেয় নাই, কেবল বলিয়াছিল, "আমার কাজের ভালোমন্দ আমি বুঝি রমা, কাউকে তা' নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। যখন যা' করবার তা' আমি করব, কারও পরামর্শ শুনে করব না।"

রঞ্জন রামায়ণের পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিল, ঝড়ের মত বেগে রমা প্রবেশ করিল—"ওগো তোমার দুটি পায়ে ধরি, ওদের বাঁচাও, ওরা ম'রে গেল।"

রঞ্জন অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিল, "কাদের বাঁচাবো—কারা ম'রে গেল, রমা?"

রমা আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "সাদেকের বাড়ীতে আগুন লেগেছে, সাদেক বাড়ী নেই। সাদেকের স্ত্রীর কাল রাত্রে একটি মেয়ে হয়েছে, এখনও তার ওঠবার ক্ষমতা নেই—সে সেই ঘরেই প'ড়ে রয়েছে।"

মুহূর্ত্তমাত্র থামিয়া একটা দম লইয়া সে আবার বলিল, "তিন-চারটি ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে সাদেকের নানী চীৎকার ক'রে লোক ডাকছে—কেউ না-গেলে বউটি মারা যাবে।"

রঞ্জন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্যাকুলভাবে বলিল, "কেউ আসে নি ?"

রমা বলিল, "না-গো, কেউ আসে নি। আজ হাট-বার, পুরুষেরা সবাই প্রায় হাটে গেছে। ভট্‌চায্যিমশাই আছেন, তিনি একবার বেরিয়ে দেখে আবার নিজের বাড়ীতে ঢুকেছেন। মুসলমানের আঁতুড়—তিনি তো ছোঁবেন না! সাদেকের নানী তাঁর পায়ে আছড়া-পিছড়ি করলে, তিনি শুধু ব'লে গেলেন, তিনি আর কি করবেন, জাতজন্ম তো ঘুচোতে পারেন না!"

দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া রঞ্জন কেবল বলিল—"উঃ!"

সে তখনই বাহির হইয়া পড়িল।

তাহার বাড়ীর পাশেই সাদেকের বাড়ী—তিনখানি ঘর, বারাণ্ডা, ধানের গোলা। কি করিয়া আগুন লাগিয়াছে কে জানে!

ধূ-ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, লেলিহান শিখা উঠিয়াছে আকাশ পানে—ধূমে গগন আচ্ছন্ন।

ইহারই একটা ঘরে পড়িয়া আছে, নবজাত-শিশুসহ সাদেকের স্ত্রী।

শক্তি থাকিলে সে পলাইতে পারিত, কিন্তু সে আজ বারোদিন সমান

জ্বরে শয্যাগতা, উঠিবার ক্ষমতা নাই। তাহার উপর গতকাল রাত্রিশেষে একটি কন্যা হওয়ায় সে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতার মত পড়িয়া আছে—আগুনের তাপ গায়ে লাগিলেও তাহার উঠিবার ক্ষমতা নাই।

কচি-শিশুটা কাঁদিতেছিল, অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতা মা তাহার গায়ের উপর একখানা হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "ইয়া-আল্লা!"

রঞ্জন যখন সাদেকের বাড়ী গিয়া পৌঁছাইল তখন মেয়েরাই বিশেষ করিয়া সেখানে ভিড় করিয়াছে।

পল্লীগ্রামে হাট সপ্তাহে দুইটি করিয়া বসে, দূর-দূর গ্রাম হইতে ক্রেতা-বিক্রেতা জিনিস বেচাকেনা করিতে হাটে আসে, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া যায়। হাটের দিনে উপযুক্ত জোয়ান-পুরুষ প্রায় থাকে না, পীড়িত, বৃদ্ধ ও শিশুরাই থাকে।

সাদেক এক-ঝুড়ি কুমড়া ও কিছু তরকারী লইয়া গিয়াছে, সেইগুলি বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে অন্য-কিছু কিনিয়া আনিবে।

বৃদ্ধেরা এবং শিশুরা তাহাদের সামর্থ্যানুযায়ী আগুন নিভাইতে চেষ্টা করিতেছিল, মেয়েরা নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া ঢালিতেছিল, কিন্তু আগুনের প্রকোপ কমিল না।

যে-ঘরে সাদেকের স্ত্রী ছিল, সেই ঘরে আগুন ধরিয়া গেল।

সাদেকের বৃদ্ধা নানী সামনে যাহাকে দেখিতেছিল তাহারই দুইখানা হাত ধরিয়া নব-প্রসূতিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনার জন্য অনুনয় করিতেছিল, কিন্তু এমন কেহ ছিল না যে সাহস করিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে। তিন-চারটি মাতৃহারা-শিশুর ক্রন্দনে এবং বৃদ্ধার ক্রন্দনে শূন্যস্থল ভরিয়া উঠিল।

রঞ্জন কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "কোন ঘরে—কোন ঘরে আছে ?"

বৃদ্ধা নানী কাঁদিতে-কাঁদিতে দেখাইয়া দিল। সে-ঘরের উপরের চাল তখন ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। একবারমাত্র চারিদিকে চাহিয়া লইয়া রঞ্জন সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

নানী অশ্রুপ্লুত-চোখে কেবল ডাকিল, "আল্লা ! আল্লা ! খোকাবাবুকে ফিরিয়ে আনো—"

সকলেই রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিল—কি হয়। অগ্নিদগ্ধ-চালা যে এখনই খসিয়া পড়িবে তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

আগুনের মধ্যে রঞ্জনকে দেখা গেল—সাদেকের স্ত্রীকে দুইহাতে অবলীলাক্রমে তুলিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইল।

সমবেত সকলে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—"খোদা ! খোদা ! মেহেরবান খোদা !"

সেই চীৎকারে সাদেকের স্ত্রীর লুপ্ত-চেতনা ফিরিয়া আসিল, ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার দেরি হইল না।

হাহাকার করিয়া সে বলিল, "আমার মেয়ে ! আমার মেয়ে।"

সদ্য-নবজাত-শিশু, তাহার উপর মায়ের কি অপরিসীম মমতা !

রঞ্জন একবারমাত্র তাহার পানে চাহিল, তারপর ললাটের ঘাম মুছিয়া—কেহ আপত্তি করিবার আগেই আবার সেই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে দৌড়াইয়া গেল।

দূরে দেখা গেল—আগুনের শিখা-বেষ্টিত রঞ্জন আর তার বুকের উপর ক্ষুদ্র একটি শিশু। কাপড় ধরিয়া উঠিয়াছে, রঞ্জনের সমস্ত গায়ের উপর দিয়া আগুনের শিখা ঢেউ-খেলিয়া নাচিতেছে।

তীর-বেগে বাহিরে আসিবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত গৃহ সশব্দে পড়িয়া গেল, সঙ্গে-সঙ্গে রঞ্জনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

"আল্লা-আল্লা! আল্লা বাঁচাও—আল্লা বাঁচাও!"

মেয়েরাই রঞ্জনকে ধরাধরি করিয়া দূরে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিল, শিশুর উপর তখন দৃষ্টি দিবার অবকাশ কাহারও ছিল না।

*

* *

রঞ্জনের বিছানার পাশে বসিয়া থাকে রমা, চাহিয়া-চাহিয়া তাহার চোখে পলক পড়ে না।

আহার নাই, নিদ্রা নাই, একভাবে মূর্চ্ছিত রঞ্জনের শিয়রে বসিয়া কয়েকটা-দিন যে কিভাবে কাটিয়াছে তাহা রমাই জানে।

সাদেকের কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। পল্লীবাসি সরল লোক, খানিকটা কাঁদিয়া-কাটিয়া একাকার করিয়াছে, তাহার পর সেই মুখ বন্ধ করিয়া নীরবে কাজ করিতেছে, এক মূহূর্ত্তের জন্য বারাণ্ডা ছাড়িয়া যায় না।

ভট্টাচার্য্যমহাশয় মুখ বক্র করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছিলেন, "নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে একটা অধম মুসলমানীকে বাঁচাতে যাওয়ার দরকারটা যে কি ছিল, তা তো বুঝতে পারি নে। এখন এই-যে বাপু ছ'মাসের মত বিছানায় শুলি, এখন তোকে দেখে কে—তোর সংসার চালায় কে? হ্যাঁ, হ'তো নিজের জাত—হিঁদুর ছেলে, তাকে বাঁচালে বরং পুণ্যি হ'তো এ-যে ন-দেবায়, ন-ধর্ম্মায়—ছ্যাঃ ছ্যাঃ, এমন কাজও মানুষে করে!"

সাদেক শুনিয়া ফুলিতে আরম্ভ করে।

প্রতিকারের উপায় তাহার বেশই জানা আছে, কিন্তু এখন সে নিতান্ত নিরুপায়। রঞ্জন ভালো না-হইলে সে কিছুই করিবে না, কাহাকেও কিছু বলিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। আজ যদি ভট্টাচার্যমহাশয় তাহাকে দশ-ঘা জুতাও মারিয়া যান, সে নিঃশব্দে সহিয়া যাইবে।

ঘরে সে প্রবেশ করিতে পারে না, হিন্দুর শুচিতা সসম্ভ্রমে বাঁচাইয়া চলে। দরজার বাহিরে বারাণ্ডায় বসিয়া সে চাহিয়া থাকে রঞ্জনের পানে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, "খোকাবাবুকে ভালো ক'রে দাও আল্লা, সওয়া-পাঁচ-আনার সিন্নি দেব দরগায়।"

প্রতিদিন সকালে একক্রোশ পথ হাঁটিয়া সে কবিরাজের নিকট হইতে ঔষধ আনে। তাহার নিজের সংসারের ভার সে শ্যালক আফগরের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার স্ত্রী সুস্থ হইয়াছে, মেয়েটি ভালো আছে, সংসারের ভাবনা তাহার নাই।

যে-কয়দিন রঞ্জন অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল সে-কয়দিন সাদেক পাগলের মত ঘুরিয়াছে, এক-একবার দরজার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আর্ত্ত-কণ্ঠে ডাকিয়াছে, "বউমা ?"

রমা আগে কোনদিন সাদেকের সহিত কথা বলে নাই, সম্পূর্ণভাবে অবগুণ্ঠনও তুলে নাই, কিন্তু এখন তাহাকে অবগুণ্ঠন খুলিতে হইয়াছে, সকলের সহিত কথাও বলিতে হয়।

সাদেকের আহ্বানে সে মুখ তুলিয়াছে। আর্ত্তকণ্ঠে সাদেক জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "দেখ তো মা, নিশ্বাস পড়ছে তো ?"

রমা চোখে দেখিয়াও সাদেকের প্রশ্নে হঠাৎ যেন সচকিত হইয়া উঠে ;

চোখে দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারে না, বুকে হাত দিয়া স্পন্দন অনুভব করে, নাকের কাছে হাত ধরে, বলে, "হ্যাঁ, নিশ্বাস পড়ছে সাদেক-চাচা।"

সাদেক যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হয়। কবিরাজকে ধরিয়া আনিয়া সে রোগী দেখায়, জিজ্ঞাসা করে, "কিরকম দেখছেন?"

কবিরাজ হাসিমুখে বলেন, "তুই-ই যে ক্ষেপে গেলি সাদেক! আমি বলছি অনেক ভালো, ভয় নেই, তবু তোর বিশ্বাস হয় না?"

"কিন্তু এমনভাবে প'ড়ে থাকেন কেন?"

রমাও কবিরাজের পানে উৎসুক নেত্রে তাকাইয়া থাকে।

কবিরাজ বলেন, "বড় বেশীরকম লেগেছে কিনা, সেই জন্যে।"

রমার চোখে জল আসে—

সে-যদি সেদিন অমন করিয়া না-পাঠাইত, তাহা হইলে তো আজ রঞ্জনকে এমন করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হইত না!

রমা ডাকে, "সাদেক-চাচা, তুমি ঘরে এসো।"

সাদেক মলিন হাসিয়া বলে, "না বউমা।"

একটু থামিয়া সে বলে, "ঘরে গেলে এখুনি কত লোকে কত কথা বলবে, তোমাদের বাড়ী আর কেউ আসবে না। কাজ কি মা ঘরে গিয়ে, আমি এইখানেই বেশ আছি।"

সাদেক পাড়ার হিন্দুদের বাড়ী গিয়া খোসামোদ করে, রমাকে যদি কেউ দুইটি ভাত রাঁধিয়া দেয়; রমা উপবাস করিয়া আছে, আজ কয়দিন তাহার ভাত খাওয়া হয় নাই। সে জাতিতে মুসলমান, হিন্দুর কোন-কিছু স্পর্শ করিবার অধিকার পর্য্যন্ত তাহার নাই।

প্রতিবাসীরা দয়া করিয়া রাজি হইলেন এবং দু'চারদিন রমাকে খাওয়াইলেন।

মেয়েরা রঞ্জনের ঘরে আসিয়া রমার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিতেন, "জাত নয়, জ্ঞাত নয়—কোথাকার কে, তার জন্যে অত মাথাব্যথাই-বা কেন? আর তাও বলি বাপু, গাঁয়ে কি আর লোক ছিল না? এই যে আমাদের কর্ত্তারা—কেউ সাড়া দিলে না টু-শব্দ করলে। তোর কেন সাধ করে ছুটে যাওয়া, কেনই-বা এ-বিপদ টেনে আনা?"

রমার পানে তাকাইয়া তাঁহারা সদুঃখে বলেন, "সঙ্গে-সঙ্গে বউটাও গেল যে। খাওয়া-দাওয়া নেই, চোখে ঘুম নেই—মা-মাগী ম'রে বেঁচেছে, তার হাড় জুড়িয়েছে, এখন এ-ছুঁড়ি গেলেই রঞ্জুর চৌদ্দপোয়া হয়।"

রমা গোপনে নিশ্বাস ফেলে।

অর্চ্চনা এখানে নাই, সে চৈতন্যকে সব দিয়া হঠাৎ একদিন কোথায় চলিয়া গিয়াছে, বলিয়া গিয়াছে, আর কোনদিন সে এখানে ফিরিবে না।

চৈতন্যদাস এখানকার জমি-জমা, বাগান, পুকুর সব বিক্রয় করিয়া দিয়া টাকা লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

আজ এই দুঃসময়ে রমার মনে কেবল অর্চ্চনার কথাই জাগিতেছিল, আজ যদি অর্চ্চনা থাকিত—একমাত্র অর্চ্চনার উপরেই সে সব ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে। রমা অর্চ্চনাকে চেনে, বিশ্বাস করে—আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

ঘরে যাহা কিছু ছিল সবই নিঃশেষ হইয়া গেল, বাকি আছে থালা-বাটি-ঘটিগুলা আর গোলায় অবশিষ্ট ধান-কয়টি।

সেদিন কৈলাসের পিসীমা আসিয়া উপস্থিত।

সম্প্রতি কাল রাত্রে তিনি কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিয়াছেন।

বাড়ীতে পদার্পণ করিতে-করিতে কাংস্যকণ্ঠে তিনি ডাক দিলেন, "হ্যাঁ-গা বউমা, বলি—রঞ্জু কেমন আছে গো বাছা, একটু ভালো আছে তো?"

রমা উঁকি দিয়া দেখিয়া কপালের কাপড়টা একটু নামাইয়া দিল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া পিসীমা একবার রঞ্জনের পানে তাকাইলেন—আঃ আমার পোড়াকপাল, সেই সোনার মত রং যে একেবারে কালি হ'য়ে গেছে গো—দেখে চেনবার যো নেই! ভাগ্যে ওর মা আজ বেঁচে নেই, থাকলে কইমাছের মত আছড়ে প্রাণটা বার ক'রে ফেলতো, হাজার হোক—মা তো! বত্রিশ-নাড়ি-ছেঁড়া-ধন, এ-কি বড় মুখের কথা গা? দশমাস দশদিন পেটে ধ'রে—"

বলিতে-বলিতে তিনি ঘন-ঘন চোখ মুছিয়া চক্ষু দুইটিকে রক্তাভ করিয়া তুলিলেন।

রমা মুখ নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পিসীমা কণ্ঠস্বরে আর্দ্রতা আনিয়া বলিলেন, "কাল তোমার সতীনের সঙ্গে দেখা—সে আমায় না-চিনুক, আমি তাকে দেখেই চিনলেম। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে শুধু চেয়ে রইল, তখন পরিচয় দিলেম। রঞ্জুর কথা তাকে বললেম, দেখলেম তার মুখখানা একেবারে সাদা হ'য়ে গেল।"

রমা মুখ তুলিল, উৎসুকভাবে বলিল, "দিদি কিছু বললেন কি?"

পিসীমা উত্তর দিলেন, "একটি কথাও না! ভাবলেম, হয়ত কিছু বলবে, জিজ্ঞাসাটাও করবে। তার আর কি বল, রঞ্জু থাকলেও যা,

না-থাকলেও তাই। আমাদের কৈলেস বলছিল, বরং না-থাকলেই নাকি ওর ভালো হয়, ও আবার পছন্দ ক'রে বিয়ে করতে পারে।"

রমা শিহরিয়া উঠিল, বিবর্ণমুখে বলিল, "না-না, তাও কি হয়—হ'তে পারে? বিধবা হ'য়ে মানুষ আবার বিয়ে করতে পারে?"

পিসীমা বলিলেন, "ওমা, তা' আবার নাকি পারে না? শহরে সব-বিধবারই আবার বিয়ে হয়। আমাদের পাড়াগাঁয়েই তো কত বিয়ে হ'চ্ছে আজকাল—তা' জানো না? ওই-যে আমাদের গেনু গো, সে আবার বিয়ে করলে না বিধবাকে—যাতে কিছু টাকাও পেলে, চাকরিও জুটলো? যাক্, ছোঁড়া বেকার হ'য়ে বসেছিল, তবু একটা হিল্লে হ'লো।"

রমা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ওদের জাতে চলতে পারে। হাড়ি, বাগ্দী, দুলেদের মধ্যে বিধবা-বিয়ে চলে ব'লে কি আমাদের ঘরে—"

পিসীমা বাধা দিয়া বলিলেন, "ওগো, ও-সব আমাদের-তোমাদের ঘরেও চলছে। কত বামুন-কায়স্থ-ঘরের বিধবা-মেয়ের আবার বিয়ে হ'চ্ছে সে-সব তো জানো না বাছা! তোমার সতীন—সে তো লেখাপড়া-জানা-মেয়ে, সে-নাকি আবার বিয়ে করবে না, তাই কি কখন হ'তে পারে?"

রমা চুপ করিয়া রহিল—

হয়ত তাই, অমুলা আবার বিবাহ করিবে। অমুলার কতটুকু পরিচয়ই-বা সে জানে—কি জানে তাহার সম্বন্ধে? মাত্র কয়টা-দিন সে এখানে আসিয়াছিল, কথাবার্ত্তা সে যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে রমার মনে একটা দাগ থাকিয়া গেছে। অমুলাকে তাহার ভালো লাগিলেও সে অমুলার মত মানিয়া লইতে পারে নাই।

স্বামীর এ-রকম অবস্থা শুনিয়াও যে বিচলিত হয় নাই, তাহার উপর রমা এতটুকু খুসি হইতে পারিল না।

*

* *

এক কলসী জল আনিবার জন্য রমা উঠানের দরজা খুলিয়াছে মাত্র, ঠিক সেই সময়ে একখানা মোটর আসিয়া পথে থামিয়া গেল।

পরম বিস্ময়ে রমা চাহিয়া দেখিল, মোটর হইতে নামিল অমলা, তাহার পিছনে একটা ছোট স্যুটকেশ-হাতে নামিলেন একটি প্রৌঢ়।

রমাকে সামনে দেখিয়াই অমলা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল, পলকের দৃষ্টিপাতে তাহার সীমন্তের সিঁদুরটা দেখিয়া হইল।

একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া সে ডাকিল, "রমা?"

রমার দুই চোখের জল আর মানা মানিল না। লজ্জা করিতে সে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহার চোখের প্রবাহিত অশ্রুধারা অমলার চোখে তাই ধরা পড়িয়া গেল।

রুদ্ধকণ্ঠে রমা বলিয়া উঠিল, "তুমি এসেছ—তুমি এসেছ দিদি? তবে উনি বাঁচবেন, আবার ভালো হ'য়ে উঠবেন।"

অমলার চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিয়াছিল, মুখ ফিরাইয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন?"

রমা উত্তর দিল, "মাঝে-মাঝে একটু-আধটু জ্ঞান হ'চ্ছে, আবার ভয়ানক যন্ত্রণায় তখুনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ছেন। তুমি এসেছ দিদি, আমি বাঁচলেম। ওঁকে দেখ, যেমন ক'রে হোক বাঁচিয়ে তোল'। সারা দিনরাত ওঁর মুখের

দিকে চেয়ে-চেয়ে একা আর আমি পারি নে—বুকের ভেতর গুম্‌রে ওঠে। আমি হতভাগীই ওঁকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ইচ্ছে ক'রে পাঠিয়েছিলেম—"

বলিতে-বলিতে সে বালিকার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অমুলা সাহস দিল—"ভয় কি বোন, আমি যখন খবর পেয়েছি, কোন ভাবনা নেই। যেমন ক'রেই হোক—বিনা চিকিৎসায় যেতে দেব না জেনে রেখো। আসুন কাকাবাবু, দেখবেন।"

এতক্ষণে রমার মনে পড়িল অমুলার সঙ্গে একজন পুরুষ আছেন। সে মাথায় কাপড় টানিয়া দিতেছিল, অমুলা বাধা দিল—"কাকাবাবুকে দেখে তোমায় ঘোমটা দিতে হবে না রমা। কাকাবাবু খুব বড় একজন ডাক্তার, আমি ওঁর এ-রকম অবস্থা শুনে কাকাবাবুকে নিয়ে আজ শেষ-রাত্রেই মোটরে রওনা হয়েছি। ভোরেই এসে পৌঁছোতেম, একজায়গায় পথ খারাপ ছিল ব'লে দেরি হ'য়ে গেল।"

বারাণ্ডায় উঠিতে-উঠিতে অমুলা বলিল, "অমন রোগীকে একা ফেলে তুমি জল আনতে যাচ্ছিলে রমা, ঘরে তো কেউ নেই দেখছি।"

রমা চোখ মুছিয়া বলিল, "কি করব দিদি, ঘরে একফোঁটা খাওয়ার জল নেই। খানিক-আগে জল খেতে চাইলেন, কলসী উপুড় ক'রে একফোঁটাও মিললো না। এতখানি বেলার মধ্যে ও-পাড়ার কেউ এলো না, যাকে বলব আমায় এক কলসী জল এনে দাও। সাদেক আছে, ওকেই রেখে আমি জল আনতে যাচ্ছিলেম।"

সাদেক দরজার বাহিরে বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমুলা বলিল, "বাইরে ব'সে থাকলে কি হবে। ঘরের ভেতর রোগী যদি ঠেলে ওঠে কিম্বা কিছু চায়?"

রমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সাদেক কি ক'রে ঘরে যাবে দিদি? ও-যে মুসলমান, আমাদের ঘরে ও-তো ঢুকবে না!"

অমুলা একমুহূর্ত্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া রমার পানে তাকাইল।

আর কোন প্রশ্ন না-করিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল।

মেঝেয় সামান্য বিছানা পাতা, তাহার উপর কলাপাতা বিছানো, রঞ্জন সেই পাতার উপর শুইয়া আছে। পিঠের দিকে কয়েকটা বড়-বড় ফোস্কা পড়িয়াছিল, পাছে ফোস্কা গলিয়া যায় ও ঘা হয় সেইজন্য কবিরাজ বিছানায় কলাপাতা পাতিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অমুলা নির্ব্বাকে রঞ্জনের পানে তাকাইয়া রহিল।

চিনিবার যো নাই এ সেই রঞ্জন। উজ্জ্বল গৌরকান্তি, সুদীর্ঘ ও সটান শরীর, মাথাভরা কোঁকড়া-কালো চুল, সুন্দর টানা ভ্রূ—একি সেই?

সমস্ত গা পুড়িয়া ফোস্কা পড়িয়া গেছে, চামড়া অনেক জায়গায় কালো হইয়া গেছে, মাথার চুল সব পুড়িয়া গিয়াছে। মুখখানা পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে—দেখিয়া কেহ আজ রঞ্জনকে চিনিতে পারিবে না।

বারাণ্ডায় কলসী নামাইয়া রাখিয়া রমা ঘরে প্রবেশ করিল—"দিদি?"

তাহার ডাকে অমুলা সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইল, উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "এ করেছ কি রমা! এই মেঝেয় এ-রকম সামান্য বিছানায় এ-রকম রোগীকে কেউ কখনও শোয়ায়? বিছানা মোটা ক'রে দেওয়া চাই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা চাই। এই পোড়া-ঘায়ে যে মলম দেওয়া হ'চ্ছে, তার কিরকম বিশ্রী গন্ধ দেখ দেখি? এ-সব রোগীকে যতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখবে, ততই শীগ্‌গির ভালো হ'য়ে উঠবে।"

রমা একেবারে নিভিয়া গেল, বলিল, "কি করব দিদি, আর বিছানা

কোথায় পাব ? ওতেই কোনরকমে আমাদের দিন কেটে যায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আমি একা তো করতে পারি নে ভাই, ওঁকে নাড়তে আমার সাহস হয় না। একে তো জোর ক'রে ওঁকে আগুনের মধ্যে ঠেলে পাঠিয়েছিলেম ব'লেই ওঁর এই অবস্থা, আবার নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে যদি আমার হাতেই ওঁর প্রাণটা বেরিয়ে যায় !"

বলিতে-বলিতে তাহার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দুইহাতে চোখ মুছিতে-মুছিতে বিকৃতকণ্ঠে সে বলিল, "সে-যে আমার চিরকালের অখ্যাতি দিদি ! আজ সবাই বলছে, আমারই জন্যে ওঁর এই অবস্থা, আর আমি না-যেতে দিলে উনি যেতেন না—এ-কথা তো আমার মনও জানে ! কেবল লোকের কাছেই নয়, আমি নিজের কাছেও যে কতখানি ছোট হ'য়ে আছি তা কেউ বুঝবে না। তাই বলছি, তুমি যখন এসেছ, দয়া ক'রে ওঁর ভার একটু নাও, আমায় একটু হাঁপ ছাড়তে দাও।"

দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল।

"রমা—রমা ?"

রঞ্জনের আহ্বান—

রমা তাহার বিছানার পাশে গিয়া দাঁড়াইল, ঝুঁকিয়া পড়িয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "কি বলছো গো, এই যে আমি আছি।"

রঞ্জন ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, তাই থাকো, তুমি আমার কাছেই থাকো, কোথাও যেয়ো না।"

সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

অমূলা স্তব্ধভাবে তাহার পানে চাহিয়াছিল। ডাক্তার বারাণ্ডায়

দাঁড়াইয়াছিলেন—অমূল্য বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "আপনি একবার দেখুন কাকাবাবু, আমার দেখতে সাহস হ'চ্ছে না।"

ডাক্তার ঘরের ভিতর গেলেন, অমূল্য বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিল। সাদেকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া সে জানিতে পারিল ব্যাপার কি ঘটিয়াছে।

পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন!

কথাটা এ-পর্য্যন্ত কাণে শুনিয়া সে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। পরের জন্য যাহারা কাজ করিতে যায়, তাহাদের মনে কোন-না-কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য থাকে, অমূল্য তাহাই জানে। কিন্তু এখানে আছে কি?

পরার্থপরতার জন্যই পরার্থপরতা, দয়ার জন্যই দয়া। জাতির অহঙ্কার নাই, অর্থের মোহ নাই, সৌন্দর্য্যের নেশা নাই, আছে মানুষের প্রতি মানুষের স্নেহ—ভালোবাসা।

অমূল্য স্তব্ধভাবে দূরের পানে তাকাইয়া থাকে।

উপকার করা খুবই ভালো সন্দেহ নাই, কিন্তু আত্মোৎসর্গ?

সম্পূর্ণ ভোগাসক্ত অন্তর এ-ত্যাগকে সহজে মানিয়া লইতে চায় না, বলে এ-সব বাড়াবাড়ি, দয়ার অপব্যবহার, এতটা না-করিলেও চলিত; সকলের যদি চলে, একজনেরই-বা চলিবে না কেন?

রান্নাঘরের চালার উপর পার্শ্ববর্ত্তী আমগাছের একটা ডাল ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। পাতার আড়ালে গা-লুকাইয়া দুইটি পাখী বসিয়াছিল, একটি চোখ মুদিয়াছিল, অপরটি চঞ্চু দিয়া তাহার ডানা-দুইটির পালক নাড়াচাড়া করিতেছিল।

ডাক্তার বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার পায়ের শব্দ পাইয়া অমূল্য সচকিতে মুখ ফিরাইল। প্রশ্ন করিবার আগেই ডাক্তার বলিলেন, "কোন

ভয় নেই মা, রোগীর অবস্থা বেশ ভালোই আছে। ওষুধ দিলেম, খাওয়াতে হবে, আর মলমটা পোড়া-জায়গাগুলোতে লাগাতে হবে। তুদিনেই রোগী বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠবে, আর শুয়ে থাকতে হবে না।"

আশ্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অম্লা বলিল, "যাক্, বউটি এবার বাঁচবে।"

ডাক্তার বলিলেন, "তাহ'লে এবার তো ফেরবার উদ্যোগ করতে হবে মা, কাল-বাদে পরশু আবার এলেই হবে।"

অম্লা বলিল, "কিন্তু, বিছানাটা বদলে একটু ভালো ক'রে দিয়ে যেতে পারলে ভালো হ'তো না কাকাবাবু?"

ডাক্তার বলিলেন, "আজ আর নাড়া-চাড়া ক'রে কাজ নেই। আর এখানে কোথায় পাবে অন্য বিছানা, কোথায় পাবে কি? এই তুদিনে রোগী আর একটু তাজা হ'য়ে উঠবে, পরশুদিন কলকাতা থেকে বিছানা এনে তারপরে ব্যবস্থা করলেই হবে। এখন তুমি চল।"

একটু ইতস্তত করিয়া অম্লা বলিল, "আমি আজ থেকেই যাই কাকাবাবু, নইলে ওই ছেলেমানুষ-বউটি ভারি কষ্ট পাবে। তা'ছাড়া ও কিছু জানে না, কি-করতে কি ক'রে বসবে কে জানে, হয়ত খাওয়ার ওষুধ ব'লে বিযাক্ত মলমটাই খাইয়ে দেবে, তখন সব-দিকই নষ্ট হবে। আমি বরং তুদিন থেকে একটু ভালো ক'রে রেখে যাই।"

শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া ডাক্তার বলিলেন, "তা' হয় না মা, আমি সেখানে ফিরে তোমার দাদাদের বলব কি? তা'ছাড়া তুমি যখন এসো তখন তো এ-কথা হয় নি যে তুমি এখানে থাকবে? তখন কথা হয়েছিল, তুমি আমারই সঙ্গে চ'লে যাবে, তোমার দাদারাও তাই জানে। এখানে এই

গ্রামের মধ্যে তোমায় একা ফেলে-রেখে যাওয়া আমার পক্ষে কোনমতেই উচিত হবে না, সেটা তো বুঝছো ?"

অমুলা একটু হাসিল, বলিল, "আমি কিন্তু কিছুকাল আগে বাবা থাকতে এখানে—এই গ্রামে সাত-আটদিন কাটিয়ে গেছি কাকাবাবু, একাই ছিলেম। দাদারা কি বলবেন ? তাঁরা জানেন আমি বয়স্থা, নিজের ভালোমন্দ বোঝবার ক্ষমতা আমার বেশ আছে। তাঁদের মত নিয়ে যে আজও আমায় চলতে হবে এমন কিছু কথা বাবা ব'লে যান নি, বা তাঁরাও আমাকে নিজেদের মতে চলাতে জোর ক'রে বাধ্য করতে পারেন না। আমি বলছি আপনি যান, আমি পরশুদিন নিশ্চয়ই যাব।

তাহার কণ্ঠস্বরে এমন দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহাতে ডাক্তার আর আপত্তি করিতে পারিলেন না।

বলিলেন, "বেশ, তবে তাই হোক। আমি তোমায় জোর ক'রে নিয়ে যেতে চাইব না অমুলা, তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর।"

অমুলা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

*

* *

রঞ্জনের যখন সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন পাশে অমুলাকে দেখিয়া সে বিস্ফারিতনেত্রে শুধু চাহিয়া রহিল, তাহার মনে হইল সে স্বপ্ন দেখিতেছে।

তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়াছে দেখিয়া অমুলা আস্তে-আস্তে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

দরজার সামনেই দেখা গেল, রামচরণ-পোদ্দারকে। সাদেককে সে জিজ্ঞাসা করিতেছে—রঞ্জন কেমন আছে, বাঁচিবে কিনা ইত্যাদি।

সাদেক সগর্ব্বে জানাইতেছে, কলিকাতা হইতে ডাক্তার আসিতেছেন, ঔষধ দিতেছেন, ভালো হইবে না তো কি? একি গাঁয়ের কবিরাজের ঔষধ যে ছয়মাস ভুগাইয়া অসুখ সারিবে?

পোদ্দার খোঁজ লইল, কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনাইল কে?

সাদেক অমুলাকে দেখাইয়া বলিল, "ওই-যে বউমা এসেছেন, আমাদের খোকাবাবুর পরিবার, উনিই এনেছেন।"

পোদ্দার একবার অমুলার পানে তাকাইল, বগলের কাগজপত্রগুলা বাহির করিয়া একবার নাড়াচাড়া করিল, তারপর বলিল, "তাই তো, এগুলো ওঁকে একবার দেখালেও হ'তো, আমার টাকাগুলো—"

অমুলা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "কি—কিসের টাকা?"

পোদ্দার কাগজপত্র আগাইয়া দিয়া সবিনয়ে বলিল, "আজ্ঞে, এই বাড়ী, জমা-জমি বন্ধকের টাকা—"

অমুলা কাগজগুলা হাতে লইয়া একবার তাহার উপর চোখ বুলাইয়া গেল, বলিল, "কত টাকা?"

পোদ্দার বলিল, "আজ্ঞে, টাকা বেশী নয়, মাত্র তিনশো, কিন্তু সুদে অনেক বেড়ে গেছে, একবছরে প্রায় সাড়ে-চারশো টাকা হয়েছে।"

অমুলা ভ্রূভঙ্গী করিল—"এত সুদ?"

পোদ্দার হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে, হিসেব ক'রে দেখতে পারেন।"

অমুলা কাগজ ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "আজ ফিরে যান, পরে উনি ভালো হ'য়ে উঠে এ-সব ব্যবস্থা করবেন।"

পোদ্দার বলিল, "কিন্তু আপনি মিটিয়ে দিলেই তো হ'তো। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, আপনি দিলেই তাঁর দেওয়া হবে, আমাদের শাস্ত্র তাই বলে।"

অম্বুলা বলিল, "আমিও জানি, কিন্তু উনি যদি বলেন তবে আমি দিতে পারব, নইলে নয়।"

পোদ্দার নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

অম্বুলা আর ঘরে গেল না, উঠানেই বৃথা ঘুরিতে লাগিল।

ডাক্তার যখন আসিলেন তখন তাঁহাকে দেখিয়া রঞ্জন একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কলিকাতা হইতে বড়-ডাক্তার আনাইল কে?

ডাক্তার রোগী দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলেন—"আর কি, এবার ভালো হ'য়ে গেছ। এই দুই মা-লক্ষ্মী যে-রকমভাবে সেবা করেছেন তাতে যমরাজা তাঁর কোল থেকে ওদের স্বামীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন।"

"দুই মা-লক্ষ্মী—"

রঞ্জন যেন আকাশ হইতে পড়িল। রমার পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে এসেছে রমা—অম্বুলা?"

রমা কেবল মাথাটা কাত করিল।

তবে রঞ্জন স্বপ্ন দেখে নাই, সে অম্বুলাকেই দেখিয়াছে। তাহার বিছানার পাশে অম্বুলাই দাঁড়াইয়াছিল। সেই ম্লান মুখ, অশ্রুসজল চোখ—সে অম্বুলারই।

কিন্তু কই, জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া রঞ্জন তো তাহাকে দেখিতে পাইল না!

ডাক্তার ঔষধ বদলাইয়া দিলেন, বলিলেন, "কাল-বাদে পরশু আবার আমি আসব মা-লক্ষ্মী, আর ভয় নেই, তোমার স্বামী দু-তিনদিনের মধ্যেই উঠে আবার কাজ করতে পারবে। বিছানায় কলাপাতা পেতে দিয়ে

ভারি বুদ্ধির কাজ করেছ, ফোস্কাগুলো গলতে পায় নি, ঘা হ'তে পারে নি। যাক, আর দু-চারদিন একটু সাবধানে রেখো, ফোস্কার ছালগুলো যেন কোনরকমে উঠে না-যায়। অমুলা তো আজই আমার সঙ্গে ফিরে যাবে, তোমার একার ওপরেই সব থাকবে।"

রমা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি—যাবেন বলেছেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "না, সে কিছু বলে নি, আমি তাকে এখন বলব। ওর দাদা আপত্তি করছে এখানে থাকতে, কথাটা একবার ব'লে দেখি।"

তিনি বাহিরে আসিলেন।

অমুলা কোথায় গিয়াছিল, এই সময় ফিরিয়া আসিল।

"এই যে কাকাবাবু, রোগীকে দেখেছেন? কেমন দেখলেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "রোগী বেশ ভালোই আছে, এখন দু-চারদিন একটু সাবধানে থাকলেই আবার স্বাভাবিক মানুষ হ'য়ে যাবে। তোমার আর তো এখানে থাকবার দরকার নেই অমুলা, আমার সঙ্গে চল। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?"

অমুলা বলিল, "হ্যাঁ, রমা দশটা না-বাজতেই খেতে দেয়। চলুন, আমি যেতে প্রস্তুত, আর আমার এখানে থাকার দরকার নেই, উনি ভালো হ'য়ে গেছেন।"

রমা দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "এখুনি যাবে দিদি?"

অমুলা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, রমার স্কন্ধে একখানা হাত রাখিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, "আর থাকলে তো চলবে না বোন, ওদিকে নিজের কাজও দেখতে হবে তো! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমরা সুখে-শান্তিতে থাকো, আমায় যেন আর না-আসতে হয়।"

রমার চোখে জল আসিতেছিল, বহুকষ্টে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "পত্র দেবে দিদি ?"

অনুলা মাথা নাড়িল—"না।"

রমা একেবারে নিভিয়া গেল।

অনুলা বুঝিল সে আঘাত পাইয়াছে, একটু হাসিয়া সে বলিল, "একে তো পত্র লেখার মত সময় আমার নেই, তারপরে হয়ত সময় করতে পারতেম, কিন্তু ভেবে দেখছি, তাতেই বা লাভ কি ? পত্র দিয়ে আত্মীয়তা জাগিয়ে রাখার পক্ষপাতিনী আমি নই রমা। অন্তরের আকর্ষণ যেখানে নেই, স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা যেখানে নেই, সেখানে বাহ্যিক-আড়ম্বরের অনুষ্ঠানই-বা করা কেন ?"

রমা মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া বলিল, "ওঁর সঙ্গেও একবার দেখা ক'রে যাবে না দিদি ?"

অনুলা মাথা নাড়িল, বলিল, "না রমা। ওঁর সঙ্গে দেখা করার দরকার আমার নেই, আমার যেটুকু দরকার ছিল তা' হয়েছে, এখন দরকার রইল —তোমার।"

ডাক্তার ডাকিলেন, "এসো অনুলা ?"

অনুলা অগ্রসর হইতেছিল, রমা বলিল, "একটু দাঁড়াও দিদি, প্রণাম করি।"

অনুলা আপত্তি করার আগেই সে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, "পরশু তুমি আসবে না দিদি ?"

অনুলা বলিল, "আর আমার আসবার দরকার হবে না রমা, উনি ভালো হ'য়ে গেছেন—কাকাবাবুর কাছেই সব খবর পাব।"

সে মোটরে গিয়া উঠিল—ড্রাইভার মোটরে ষ্টার্ট দিল। প্রচুর ধূলা পিছনে উড়াইয়া গ্রাম্যপথে মোটর ছুটিল।

রমা ঘরে ফিরিয়া গেল।

রঞ্জন চোখের উপর একখানা হাত আড়ভাবে রাখিয়া শুইয়াছিল; জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁরা চ'লে গেলেন?"

শুষ্ককণ্ঠে রমা উত্তর দিল—"হ্যাঁ, চ'লে গেলেন।"

রঞ্জন বলিল, "ডাক্তারকে অমূলাই এনেছিল?"

রমা বলিল, "হ্যাঁ।"

রঞ্জন মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "অমূলা আর আসবে না—না?"

রমা উত্তর দিল—"না।"

রঞ্জন আর কথা বলিল না।

*

* *

অমূলা এম-এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল।

পুষ্পল জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর—এইবার?"

অমূলা উত্তর দিল, "দেখি, হয় রিসার্চ্চ নয় বিলেত যাওয়া।"

পুষ্পল উপহাস করিল, "ভাই বিলেত গিয়ে একটি মেম সঙ্গে ক'রে এনেছে, তুমি বিলেত গিয়ে সাহেব নিয়ে আসবে তো?"

অমূলা গম্ভীরভাবে বামহাতখানা তাহার সাম্‌নে বাড়াইয়া দিল, আঙ্গুল দিয়া হাতের লোহাগাছটি দেখাইল।

পুষ্পল বলিল, "ওর দাম একটি পয়সা মাত্র, দশগাছা পথে প'ড়ে থাকলেও কেউ তুলবে না।"

অম্লা বলিল, "তুলবে না—মূল্যহীন ব'লে নয়, তোলবার সামর্থ্য নেই ব'লেই। হয়ত এক পয়সাও দাম এর নয়, কিন্তু পরবার মত অধিকারই বা ক'জন পায় বল তো পুষ্পল? তোমার সে-সৌভাগ্য হ'লো না তাই, কিন্তু যদি সে অধিকার পেতে?"

পুষ্পল একমুহূর্ত্ত নীরব রহিল, তাহার পর বলিল, "কিন্তু মানুষ ঝোঁকের বশে অনেক কাজও ক'রে বসে অম্লা।"

অম্লা বলিল, "আমার সিঁথার সিঁদুর?"

পুষ্পল বলিল, "না-দিলেও ক্ষতি নেই—অনেকে পরে না, তুমিও পরতে না, সম্প্রতি পরছো মাত্র। তাও আমার মনে হয় কেবল জিদের বশে। রণেন্দ্রবাবু, বিনিময়, মৃগাঙ্ক মিত্র প্রভৃতি লোকগুলোর সামনে বিরাট বাধার সৃষ্টি করাই তোমার সিঁদুর আর লোহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বল, আমার কথা সত্যি কিনা?"

অম্লা গম্ভীরভাবে বলিল, "এ-কথা অতি সত্য। সেদিন আমাদের কলেজে এই কথা নিয়েই তর্ক উঠেছিল যে, বিবাহিতা-মেয়েদের হাতে লোহা আর সিঁথায় সিঁদুর পরবার উদ্দেশ্য কি? আদিমযুগে যে এ-নিদর্শন ছিল না, রাখবার দরকারও হ'তো না তা' আমরা সে-যুগের ইতিহাস প'ড়েই জানতে পারি। তখন নারী ছিল বীরের অধিকারের জিনিস, যার শক্তি থাকতো সেই নারীকে অধিকার করত। প্রকৃতপক্ষে নারীর স্বামী হ'তে পারত সেই—যে নারীর ভরণপোষণ যতদিনের জন্যে নির্ব্বাহ করতে পারত। আজও এ-কথা প্রচলিত আছে—বীরভোগ্যা

বসুন্ধরা। কারণ, বসুন্ধরাকে নিয়ে সমাজ সৃষ্ট হয় নি, কিন্তু নারীকে নিয়ে হয়েছে। যাক, কথান্তরে এসে পড়েছি। কথাটা ছিল—নারীর সিঁথায় সিঁদুর এবং হাতের লোহা, এ-দুটোই অধিকারের চিহ্ন। কুমারী-মেয়ে পিতৃ-অধিকারে যতক্ষণ থাকে ততদিন সে জয়ের গৌরবলাভ ক'রে থাকে শুধু স্নেহের দাবীতে। যে তাকে গ্রহণ করবে, সে দিয়ে দেবে তার সিঁথায় সিঁদুর—রক্তের চিহ্ন, অর্থাৎ বিনা-রক্তপাতে নারীকে অধিকার করা সেদিন সম্ভব হ'তো না। আর দিত হাতে লোহা—এই হ'লো নারীর শৃঙ্খল, মুক্তির আশা ততদিন থাকবে স্বপ্নের মত, যতদিন এ-চিহ্ন তার হাতে থাকবে।"

পুষ্পল হাসি চাপিয়া বলিল, "চমৎকার ব্যাখ্যা, এর ওপর টীকা নিষ্প্রয়োজন। কঠোর ডাক্তারী-শাস্ত্র, শুধু অ্যানাটমি—কোথায় কোন নার্ভ আছে, কোথায় লিভার, কোথায় স্পাইনাল-কর্ডের সঙ্গে মেডালার যোগ শুধু তাই খোঁজ কর। মানুষের কাঠামোর বাইরে হাজার জিনিস, যার অ্যানালিসিস্ করা দুরূহ—অতি দুরূহ। এইমুহূর্ত্তে আমি বুঝছি, বর্ত্তমানযুগে মেয়েরা যে বিয়ে করতে চায় না তার মূলে রয়েছে এই মুক্তি। তাদের প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করুক, প্রগতি জয়শীল হোক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।"

অন্নলা বলিল, "তোমার তামাসা অসহ্য পুষ্পল। তুমি ইতিহাস পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটু-একটু সাহিত্যালোচনা কর দেখি, অনেক-কিছু তখন বুঝতে পারবে—জানতেও পারবে।"

পুষ্পল হাতজোড় করিল—"রক্ষে কর, সাহিত্যালোচনায় আর আমার দরকার নেই। আমি মোটামুটি বুঝছি, তুমি কতকগুলো লোককে

এড়ানোর জন্যেই জোর ক'রে অতবড় ক'রে সিঁথায় সিঁদুর দাও, লোহাটা হাতে দাও।"

অমুলা বলিল, "সত্যিই তাই—ওরা পিছিয়ে যাক, ওরা জানুক আমি অধিকৃত, আমি মুক্ত নই।"

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "ওরা তবু আসে, তবু ঘিরে থাকতে চায়, তবু করে মারামারি—ঝগড়া। কেন জানো পুষ্পল? দুরন্ত লোভ—কেবল আমার দেহের ওপর নয়, আমার সম্পত্তির ওপর, আমার বাড়ীর ওপর। মানুষের এই লোভ আমায় বড় ব্যথিত ক'রে তোলে, মনে অপর্য্যাপ্ত ঘৃণা জাগিয়ে তোলে।"

পুষ্পল বলিল, "যাক, অবশেষে বুঝলেম, বিলেতে গেলেও তুমি ঠিক এই-বেশেই ফিরে আসবে—প্রাণে তবু শান্তি পেলেম।"

ইহারই মাঝখানে আসিয়া পড়িল মায়া। একটি সন্তানের সে মা হইয়াছে। কোলের মেয়েটির বয়স মাত্র একবৎসর, মায়া তাহাকে আনিয়া ঘরের মধ্যে ছাড়িয়া দিল—"কি কথা হ'চ্ছে তোমাদের পুষ্পল?"

পুষ্পল সকৌতুকে বলিল, "তোমার মেয়ের কথা বউদি। অমুলা বিলেতে যাবে কিনা—বলছে তোমার মেয়েকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে, ওখানে ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবে।"

মায়া মেয়ের পানে তাকাইয়া বলিল, "মানুষ যদি হবার হয় এখানে থেকেই হবে, সেজন্যে বিলেতে যাওয়ার দরকার হবে না পুষ্পল। আমাদের সবারই মনে একটা মস্তবড় ধারণা আছে, বিলেতে না-গেলে মানুষ হ'তে পারে না, অথচ সে-কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যে সে-কথা সবাই জানে। এই-যে অমুলার দাদা বিলেত ঘুরে এসেছে, কি লাভ হয়েছে তাতে?"

সে জিজ্ঞাসুনেত্রে অম্লা ও পুষ্পলের পানে তাকাইল।

পুষ্পল একটু হাসিয়া বলিল, "শিক্ষা যতদূর হোক না-হোক সভ্যতাটা শিখতে পারা যায়, এ-কথা তো অস্বীকার করা চ'লে না বউদি ?"

মায়া বলিল, "শাঁস ফেলে আঁটি লাভ আর কি ! আমার মেয়েকে আমি অতি-শিক্ষিতা করব না—ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়বে, তারপর বিয়ে দিয়ে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেব।"

অম্লার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

পুষ্পল বলিল, "নিশ্চয়ই এমন জামাই করবে, যে তোমার মেয়ের চেয়েও বেশী লেখাপড়া জানবে ?"

মায়া অপ্রস্তুত হইয়া বলিল' "কি ক'রে বলব ! হয়ত ভাবছি এক, হবে আর-এক। যাক সে কথা, অম্লা বিলেতে যাবে কে বললে ?"

অম্লা মুখ তুলিল—"আমিই বলছি বউদি, এখানকার পড়া তো শেষ হ'য়ে গেল, আর এখন কি করব ?"

মায়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কেন, তোমার দাদা যে বলছিলেন কোন কাজ নিতে বা রিসার্চ্চ করতে ?"

অম্লা বলিল, "আমি কোন বৃত্তির চেষ্টা করছি, যদি পাই, বিলেতে চ'লে যাব।"

পুষ্পল বলিল, "জানো বউদি, অম্লা নাকি সাহেব বিয়ে ক'রে আনবে, ওর ছোড়দা যেমন মেম বিয়ে ক'রে এনেছে।"

বলিতে-বলিতে সে হাসিয়া উঠিল।

মায়া বলিল, "তা, ওরা করতে পারে, ভাইয়ের বোন তো ? কেবল রক্ত কেন, চিন্তাধারারও অনেক মিল আছে, কাজেরই-বা মিল থাকবে না

কেন ? তবে কথা হ'চ্ছে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রে তবেই যদি বিয়ে করতে পারা যায়, এ-ধর্ম্মে থেকে নয়।”

পুষ্পল আড়চোখে অম্লার পানে তাকাইয়া বলিল, “অম্লাও তো তাই করবে। আজকাল অনেক মেয়েই তো তাই করে—ওটা বেশ নিয়ম হয়েছে বউদি, একমাত্র হিন্দুধর্ম্ম-বাদে আর যে-কোন ধর্ম্মে বিয়ে করতে পারা যায়।”

মায়া বলিল, “হ্যাঁ, দায়ে পড়লেই লোকে বৈষ্ণব হয় কিনা !”

অম্লা বলিল, “সৌভাগ্যের কথা—আমার দ্বারা সে-কাজটা হবে না বউদি, আমার সংস্কারই আমায় বাধা দেবে। শিক্ষা এবং সংস্কার, এদের মধ্যে আঘাত লাগলেও মনে হয়, সংস্কারই অনেক সময় জয়লাভ করে। আমি সে-কথা ভুলি নি বউদি—আমি এ-দেশের মেয়ে, আমার মা এই সংস্কারই আমাদের মনে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। তোমরা আমায় সাহস দাও, আমি যেন সেই সংস্কার আমার মনে জাগিয়ে রাখতে পারি।”

পুষ্পল মৃদু হাসিয়া বলিল, “বউদি না-জানুন, আমি জানি এবং বিশ্বাস করি অম্লা, সে-সংস্কার তোমার মন হ'তে লুপ্ত হবে না। তামাসা ক'রে তোমায় যাই বলি না, জানি তুমি কি, তোমার কাজই সে পরিচয় দিয়েছে, কাজেই সে-কথা আর ব'লে দরকার নেই। তুমি কিছু না-প্রকাশ করতে পারো অম্লা, অনেক-কিছু চেপে যেতে পারো, কিন্তু কাকাবাবু অনেক কিছুই ব্যক্ত ক'রে ফেলেছেন।”

মায়া হাসিয়া বলিল,“তাঁকে অনেক ক'রে অনুনয়-বিনয় এবং উৎকোচের প্রলোভন দেখানো সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন অম্লা।”

অম্লা খুকুকে কোলে টানিয়া লইয়া অকারণে তাহাকে টিপিয়া, চড় মারিয়া কাঁদাইল।

পুষ্পল খুকুকে তাহার কোল হইতে টানিয়া লইয়া বলিল, "বেচারা-খুকুকে কাঁদিয়ে কোন লাভ নেই, বরং বুড়ো-কাকাবাবুর পিঠে গোটাকত কিল বসিয়ে দিয়ে আসা উচিত। কি আশ্চর্য্য! আমরা কেউ জানি নে, রাত ন'টার সময় ভদ্রলোকের মেয়ে—একা বাড়ীর বার হওয়া, ডাক্তারকে ব'লে ঠিক করা, তারপর বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছি ব'লে বেরিয়ে শেষরাত্রে ডাক্তার নিয়ে মোটরে রওনা হওয়া এবং সেখানে দুদিন কাটিয়ে আসা—অমার্জ্জনীয় অপরাধ অন্নলা, এ-অপরাধ কোনমতে ক্ষমা করা যায় না, কি বল বউদি?"

মায়া কপট-গাম্ভীর্য্য দেখাইয়া বলিল, "নিশ্চয়ই, খুব সত্যি। অন্নলার সাহেব-ভাইটি তো রেগেই আগুন, বাঙ্গালী-ভাই শুধু একটু হাসলেন। কেউ কিছু না-বললেও বাঙ্গালী-ভাইটি আন্দাজেই কতকটা বুঝেছিলেন।"

অন্নলা বলিল, "মেম-বউদি কিছু না-বুঝলেও বাঙ্গালী-বউদি সব বোঝে কিনা—এ-সব যে তারই কারসাজি, সেটা বুঝতে আমার বাকি নেই।"

মায়া হাসিতে লাগিল, পুষ্পল উঠিল, বলিল, "আজ উঠি ভাই, হস্‌পিটালে ডিউটি আছে।"

সে চলিয়া গেল।

*

* *

হঠাৎ চৈতন্য দাসের সঙ্গে দেখা। তাহার সে লক্ষ্মীছাড়ার চেহারা আর নাই, হাতে পয়সা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার চেহারারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে

যথেষ্ট। চৈতন্য দাসের গায়ে মাংস লাগিয়াছে, মাথার চুলে তৈল চক্‌চক্ করিতেছে, পরনে দশহাতি ধুতি, গায়ে সার্ট, পায়ে জুতা—

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, "কিরকম—সব ভালো তো?"

চৈতন্য তাহাকে দেখিয়া পাশ-কাটাইবার চেষ্টায় ছিল, নেহাৎ সাম্‌না-সাম্‌নি আসিয়া পড়িয়া ভারি বিব্রত হইয়া পড়িল।

বলিল, "আজ্ঞে, তা' বেশই আছি। আপনাদের সব ভালো তো? আপনার সেই পরিবারটি এখানেই আছেন নিশ্চয়?"

রঞ্জন একটু হাসিয়া বলিল, "না, তিনি তো থাকবার জন্যে আসেন নি, একবার বেড়াতে এসেছিলেন—বেড়িয়েই চ'লে গেছেন। অর্চ্চনা কেমন আছে, তার তো আর কোন সাড়াশব্দ পাই নে?"

চৈতন্য শুষ্ক-হাসিয়া বলিল, "পাবেন আর কি ক'রে? সে কি আছে যে সাড়াশব্দ দেবে?"

"নেই—মানে?"

রঞ্জন যেন আকাশ হইতে পড়িল। এ-কি বিশ্বাসযোগ্য কথা—অর্চ্চনা নাই? অর্চ্চনা—সেই অর্চ্চনা—

চৈতন্য বলিল, "ম'রে নি—বেঁচে আছে!"

রঞ্জন বিস্ময়ে বলিল, "বেঁচে আছে—কোথায় আছে সে?"

চৈতন্য আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "আপনাকে আর বলব কি রঞ্জনবাবু, সে-লজ্জার কথা আর না-বলাই ভালো। গাঁয়ে তো মুখ দেখানোর পথ প্রায় বন্ধ। সবাই আঙ্গুল দিয়ে দেখায় আর হাসে।

রঞ্জন অকস্মাৎ রূঢ় হইয়া উঠিল, বলিল, "ব্যাপার কি তাই আগে বলুন, আপনাকে দেখিয়ে কে হাসে না-হাসে সে-কথা পরে শোনা যাবে-এখন।"

তাহার রূঢ় কণ্ঠস্বরে চৈতন্য যেন বড় বেশী সচেতন হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি বলিল, "সেই কথাই তো বলছি রঞ্জনবাবু, আপনি হঠাৎ রেগে উঠছেন কেন? এখান থেকে যাওয়ার দু-চারদিন পরে একদিন রাত্রে সে কোথায় চ'লে গেছে, আর তার খোঁজ পাই নি।"

দীর্ঘ দেড়-বৎসরের কথা—রঞ্জন স্তব্ধ হইয়া গেল।

কোথায় সে চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে তাই-বা কে জানে!

তাহার কঠিন মুখখানার পানে তাকাইয়া চৈতন্য রীতিমত ঘামিতেছিল। রঞ্জন একবার তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিলেই সে গিয়াছে আর কি!

তবু মিনিট-কয়েক দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে আস্তে-আস্তে সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল, রঞ্জন বাধা দিল—"দাঁড়ান। আজ দেড়-বছর সে চ'লে গেছে, এর মধ্যে আপনি আমাকে একবার খবর দিতে পারেন নি?"

শুষ্কমুখে চৈতন্য বলিল, "দিয়েছিলেম তো, তখন যে আপনার অসুখ, আপনি বিছানায় প'ড়ে।"

রঞ্জন মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "তার কোন সন্ধান করেছিলেন?"

চৈতন্য বলিতে গেল—"করেছিলেম, কিন্তু—"

রঞ্জন ধমক দিল, "না, আপনি করেন নি, আপনি মিছে-কথা বলছেন। আপনার সম্পর্ক ছিল কেবল তার সম্পত্তি নিয়ে। যে-মুহূর্ত্তে সে তা' লিখে দিয়েছে, সেইমুহূর্ত্তে আপনার সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক ফুরিয়েছে। তবু আপনি আমায় অনর্থক মিছে-কথা বলছেন—তার সন্ধান করেছেন? যান, আপনার মুখ দেখলেও পাপ হয়।"

চৈতন্য হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, কয়েক-সেকেণ্ডের মধ্যেই সে উধাও হইয়া গেল।

ক্লান্ত-পদে রঞ্জন বাড়ী ফিরিল।

এই স্বামী—ইহারই জন্য অর্চ্চনা কি না-করিয়াছিল! ইহাকেই সে বাঁচাইয়াছে, নিজের যথাসর্ব্বস্ব ইহাকেই সে দান করিয়া নিজে নিঃশব্দে একদিন রাতের অন্ধকারে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে।

কেন—সে রঞ্জনের কাছে আসিতে পারিল না? রঞ্জনের কুঁড়ে-ঘরে অর্চ্চনার স্থান কি হইত না?

রঞ্জন জানে না কেন অর্চ্চনা আসে নাই। যে-স্বামীকে ভালোবাসিয়া অর্চ্চনা সব ছাড়িয়াছে, লোকের ঘৃণা তাচ্ছিল্য কুড়াইয়াছে, সেই স্বামীর বক্রোক্তি সে সহ্য করিতে পারে নাই। রঞ্জনকে লইয়া তাহার উপহাস অর্চ্চনার প্রাণে আঘাত দিয়াছিল তাই অর্চ্চনা সব ছাড়িয়া গিয়াছে, রঞ্জনের কাছে আসে নাই।

বাড়ী ফিরিয়াই রঞ্জন থমকিয়া দাঁড়াইল। বাড়ী লোকে-লোকারণ্য!

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন, "আরে ছ্যাঃ! টাকা ধার করার আর লোক পেলে না রঞ্জু, তাই গেলে ওই চশমখোর দালালটার কাছে? সে আজ আদালতের পরোয়ানা এনে তোমার ঘর-বাড়ী, বাগান, স্থাবর-অস্থাবর জিনিস—সব দখল করে নিলে!"

রঞ্জন রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "রমা—সে গেল কোথায়?"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন, "বউমা সাদেকের ঘরে উঠেছেন।"

একটু থামিয়া গলার সুর নামাইয়া তিনি বলিলেন, "সাদেকের সব-তাতেই বাড়াবাড়ি। লাঠি নিয়ে হৈ-হৈ ক'রে এসে পড়েছে ডাকাতের

মত। ঘরে ঢোকা দূরে যাক—দাওয়ার ধারে কাউকে যেতে দেবে না। কেন রে বাপু, তোর এত মাথা-ব্যথা কিসের? এরপর যখন ফৌজদারিতে পড়বি তখন তোকে বাঁচাবে কে? এত ক'রে বললেম, গোঁয়ার কিনা—ওকি আমার কথা শোনে?"

রঞ্জনের মুখে অতি শান্ত হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, বলিল, "ওরা গরীব বটে, কিন্তু উপকারীর উপকার ওরাই স্বীকার করে।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় রাগ করিয়া বলিলেন, "সে তো করবারই কথা। তুমি বাপু নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে ওর স্ত্রী, কন্যাকে বাঁচিয়েছ, ও করবেনা-ই-বা কেন? যদি না-করতো, সেইটাই হ'তো নেমক-হারামী। আর কার জন্তেই বা তুমি নিজের জীবন তুচ্ছ করতে গেছ বাবাজি, কেই-বা ওর মতন করবে। তবু আমি বললেম, বউমা, আমার বাড়ী এসো, হাজার-হোক আমি তোমার জানাশোনা লোক—জাতে বামুন, আমার বাড়ী আসা তোমার পক্ষে লজ্জার কথা নয়। বউমা কিনা আমার কথা ঠেলে উঠলেন গিয়ে ওই মুসলমানের ঘরে। জাত-জন্ম সব গেল—কিছু রাখলে না।"

রঞ্জন অগ্রসর হইতেই রামচরণ-পোদ্দার তাহার হাতে একখানা কাগজ দিল—ক্রোকের আদেশপত্র।

রঞ্জন একবার দেখিয়া লইয়া ফিরাইয়া দিল, বলিল, "একেবারেই এতটা এগিয়ে এলে পোদ্দার, একমাস সময় চাইলেম, তাও দিলে না। অবিশ্যি—দিলেই তুমি দিতে পারতে। যাক, ক্রোক করতে এসেছ—কর। আছে শুধু ঘর দুখানা, তাও চালা দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়ে, সারারাত মাদুর বালিস টেনে-টেনে সারাঘরে দৌড়োদৌড়ি করতে হয়।"

বলিতে-বলিতে সে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তাহার হাসি দেখিয়া সকলেই মনে করিল তাহার মাথা খারাপ হইয়া গেছে, সেইজন্য বিস্ফারিতনেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

সেদিকে লক্ষ্য না-করিয়া রঞ্জন বলিল, "ঘরে আছে দুটো মাটীর হাঁড়ি-কলসী, ভাঙ্গা ঝুড়ি-চুপড়ি আর ষ্টীলের থালা-গেলাস। তা' তুমি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যাও পোদ্দার। তবে একেবারে ঠকবে না, জমিটার দাম কিছু মিলবে, ওই আম-গাছটার দামও কিছু মিলবে। ওটা ল্যাংড়া-আমের গাছ, আমার বাবা পুঁতেছিলেন—প্রতিবছর ফলেও তেমনি। ওর জন্যে আমার দুঃখ নেই, জন্ম থেকে ও-গাছের আম খেয়ে-খেয়ে অরুচি হ'য়ে গেছে, এখন স্বচ্ছন্দে তুমি ভোগ কর, খাও, বিলোও, বিক্রি কর—"

সে দুই-পা অগ্রসর হইতেই সাদেক সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

প্রকাণ্ড একটা লাঠি হাতে, তেমনই বিরাট চেহারা। সমস্ত গা অনাবৃত, পেশীগুলা স্পষ্ট দেখা যায়।

রঞ্জন ডাকিল, "দাওয়া থেকে নেমে এসো সাদেক, আদালতের হুকুম তামিল ক'রে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কি হবে অনর্থক ফৌজদারি-ব্যাপারের মধ্যে প'ড়ে? আর কি-ই-বা আছে ঘরে, কিছু নেই। যা' আছে তা' বিক্রি ক'রে একটিও পয়সা হবে না—উঠবে যা' জমির-ই দাম। সব ছেড়ে দিয়ে চ'লে এসো সাদেক, তোমার বাড়ীতে চল।"

তাহার আদেশ অমান্য করিতে সাদেক পারিল না।

লাঠিগাছটা বগলে লইয়া নামিয়া বলিল, "সে গেল কোথায়—সেই সুমুন্দি পোদ্দারের পো? একবার দেখতে পেলে হ'তো, তাকে একবার বুঝিয়ে দিতেম ক্রোক করার মজাটা—"

পোদ্দার হঠাৎ কোথায় গা-ঢাকা দিল তাহাকে আর দেখা গেল না।

*
* *

গ্রামের লোক রঞ্জনকে 'এক-ঘরে' করিয়াছে।

কিন্তু তাহাতে তাহার আসে-যায় কি? সমাজ তাহাকে গ্রহণ নাই-বা করিল, রঞ্জনের তাহাতে কিছু আসে-যায় না।

সাদেক একখানি ঘর ছাড়িয়া দিয়াছে, রঞ্জন সস্ত্রীক সেই ঘরে থাকে। কিন্তু দিন চলিবে কি করিয়া? দরিদ্র সাদেকের গলগ্রহ হইয়া রঞ্জন থাকিতে পারে না।

যেখানেই সে কাজের চেষ্টায় গেল, সেইখানেই শুনিল অপমানের কথা। কেহ তাহাকে কাজ দিল না, কেহ তাহার কথা কাণে তুলিল না।

রঞ্জন প্রতিদিনই ফিরিয়া আসে—মলিন মুখ, হতাশায় পা-দুইটি যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে।

একদিন রমা বলিল, "তুমি একবার কলকাতায় যাওনা, সেখানে গেলে নিশ্চয়ই চাকরি মিলবে। যা-হয় পনেরো-কুড়ি টাকার একটা কাজও যদি পাও, তাহ'লে আমরা একটা খোলার ঘর ভাড়া ক'রে থাকব, শাক-ভাত খেয়েই না-হয় দিন কাটাব।"

রঞ্জন একটু হাসিল, বলিল, "কলকাতায় কাজ? জানো রমা, কলকাতায় কাজ মেলা বড় শক্ত। পাড়াগাঁয়ে বেকার হয়ত আছে, কিন্তু কলকাতার বেকারের সংখ্যার চেয়ে কম, আর দারিদ্র্য-কষ্টও কম দেখা যায়। এখানে থেকে তবু অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয় নি, কিন্তু কলকাতায় থাকলে শুকিয়ে মরতেই হবে, কারণ এক-ঘটি জলেরও সেখানে দাম আছে।"

রমা বলিল, "ওই তো এ-গাঁয়ের বেজা, হ'রে, কেষ্টা, রাখ্‌লা, মধো—সবাই কলকাতায় কাজ ক'রে খাচ্ছে, তবু তো ওরা লেখাপড়া জানে না, অথচ মাস গেলে যথেষ্ট উপায় করে। তুমি তো অনেক লেখাপড়া জানো, তোমার কাজ জুটবে না ?"

অনেক লেখাপড়া ? কথাটা শুনিয়া হাসি আসে।

কলিকাতার মত জনবহুল শহরে কত বি-এ, এম-এ পাশ ছেলে সামান্য কুড়ি-পঁচিশ টাকার কাজই পায় না, কত শিক্ষিত-বেকার পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেখানে যত লোক বাস করে তাহাদের উপযুক্ত অন্নসংস্থান করিবে কে—কতগুলি কার্য্যালয়, কল-কারখানা আছে ? যেমন নূতন-নূতন অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে, তেমনি অনেক লোকও কাজ পাইতেছে, কিন্তু সকলের অন্নসংস্থান হইয়াছে কি ?

আত্মহত্যা করিয়া মরিতেছে শিক্ষিত-বেকার, আত্মবিক্রয় করিতেছে শিক্ষিত-বেকার, চুরি-ডাকাতি খুন করিতেছে শিক্ষিত-বেকার। সেই তাহাদের একমুষ্টি অন্নের ভাগ নিতে যাইবে রঞ্জন—তাহাদের সাড়ে-তিনহাত জমিতে ভাগ বসাইতে যাইবে রঞ্জন—কতটুকু যোগ্যতা আছে তাহার ?

একমাত্র দৈহিক-শক্তিই মাত্র তাহার সম্বল, আর কিছুই তাহার নাই।

হ্যাঁ, সে শক্তির পরিবর্ত্তে অর্থ আনিবে, আহার সংগ্রহ করিবে। সাদেকের একটা উপকার সে কবে করিয়াছিল, তাহার অসুখের সময় সাদেক সে-ঋণ পরিশোধ করিয়াছে, আজও তাহারই জের টানিয়া চলা রঞ্জনের উচিত হয় নাই।

কিন্তু ট্রেন-ভাড়া ?

আর কলিকাতায় গিয়াই যে কাজ পাইবে তাহারও ঠিক নাই, কাজেই দিন-দুই-তিনের মত আহার্য্যের উপযুক্ত পয়সা—

রমার হাতে সোনা-বাঁধানো একটি লোহাই সম্বল—আর কিছু নাই। এতদিন এত কষ্ট গিয়াছে, রমা এটা খুলে নাই, শাশুড়ীর প্রথম ও শেষ আশীর্ব্বাদ এই লোহাটিকে সে পরম যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

রঞ্জনের দিকে বামহাতখানা প্রসারিত করিয়া দিয়া সে বলিল, "এইটা খুলে নিয়ে বিক্রি ক'রে দাও, পাঁচ-সাত টাকা পাওয়া যাবে-এখন।"

রঞ্জন সঙ্কুচিত হইয়া গেল—"ছিঃ রমা! শেষে তোমার সোনা-বাঁধা-লোহাটা খুলে নেব? আমি পারব না।"

অনুনয়ের সুরে রমা বলিল, "নাও গো, তাতে কোন দোষ হবে না। আসল লোহা আমার হাতে আছে। তুমি বেঁচে থাকো, আমার অনেক সোনা-বাঁধানো লোহা হবে।"

হাল ছাড়িয়া দিয়া রঞ্জন বলিল, "তবে তুমি খুলে দাও।"

রমা বলিল, "আমি দেব না। তুমি নিজে খুলে নিলে কোন দোষ হবে না—তুমি খুলে নাও।"

রঞ্জন তাহার জিদে লোহা খুলিল। পোদ্দারের কাছে সে গেল না, সোজা ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের কাছে গেল।

ভট্টাচার্য্যমহাশয় লোহাটা নাড়াচাড়া করিয়া বলিলেন, "ভারি কম সোনা রয়েছে—কতটা আছে আন্দাজ?"

রঞ্জন বলিল, "ঠিক বলতে পারি নে। আপনি ওজন করলেই বুঝতে পারবেন।"

ওজন করাইয়া দেখা গেল এবং সেটার মূল্য হইল মোট সাত টাকা।

টাকা-কয়টি লইয়া রঞ্জন ফিরিয়া আসিয়া রমার হাতে দিল, আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "যা' কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি রমা, আজ সত্যিই তাই হ'লো। আমি নিজে তোমায় কোনদিন কিছু দিতে পারি নে, আমার মা তোমায় তাঁর যে শেষ চিহ্নটুকু দিয়ে গিয়েছিলেন, অক্ষম আমি—তা' নষ্ট করলেম।"

রমা স্বামীর পায়ে একটা প্রণাম করিয়া বলিল, "আমার আর কিছু চাই নে, কেবল তোমায় যেন রোজ প্রণাম করতে পাই, এইটুকুই আমার ভগবানের কাছে প্রার্থনা। এই টাকা নিয়ে তুমি কলকাতায় যাও, গিয়ে কাজের যোগাড় দেখ। একটা কাজ পেলেই আমায় নিয়ে যেয়ো, যেমন ক'রে হোক আমি সেখানে দিন কাটিয়ে দেব।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "শুনেছি কলকাতায় গরীব-মেয়েরাও ঘরে ব'সে কাজ ক'রে পয়সা উপার্জ্জন করে। আমিও করব, তুমি শুধু কাজ যোগাড ক'রে এনে দিয়ো। মেয়েরা সুপুরী কাটে, বিঁড়ি বাঁধে, ঠোঙা গড়ে, আমিও সে-সব কাজ ক'রে তোমায় অনেকটা সাহায্য করতে পারব।"

রঞ্জন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হয়ত সবই করতে হবে—চাই কি দাসীবৃত্তি পর্য্যন্ত।"

বলিতে-বলিতে সে হাসিল, বলিল, "বেকার-স্বামীকে খেটেও খাওয়াতে হবে—সৌভাগ্যবশতঃ এ-রকম দৃশ্য এ-দেশে ঢের দেখতে পাওয়া যায়, কাজেই তোমার লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ থাকবে না। বরং লোকে বলবে—হ্যাঁ, মেয়ে বটে রমা, স্বামীকে উপার্জ্জন ক'রে এনে খাওয়াচ্ছে, সংসার চালাচ্ছে। আজকালকার দিনে এ-বড় কম গর্ব্ব নয় রমা। তখন চাই-কি, তুমিই আমাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলবে, রাগ হ'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলবে।"

রমা রাগ করিল, খানিকক্ষণ কথা বলিল না।

কিন্তু উত্তর তাহাকে দিতেই হইবে—সে বলিল, "তোমাকে অমনভাবে আমার কাছে হাত পাতবার আগে তুমি আত্মহত্যা ক'রো—আমিও করব। আমি লেখাপড়া জানি নে, দিদির মত শিক্ষা আমি পাই নি, আমি জানি তোমার সেবাই আমার সার ধর্ম্ম, তোমার কাজে এতটুকু সাহায্য করতে পাওয়াই আমার পরম সৌভাগ্য। তোমায় ছোট ক'রে নিজে বড় হ'তে আমি চাই নে তুমি তা জানো—আর তাই জেনেই আমাকে বার-বার এমনি ক'রে কথা শোনাও।"

বলিতে-বলিতে সে উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া রঞ্জন বলিল, "আচ্ছা ছেলেমানুষ তো, অমনি কেঁদে ভাসিয়ে দিলে? ঠাট্টা ক'রে একটা কথাই যদি তোমাকে ব'লে থাকি, তুমি অমনি সেটাকে সত্যি ব'লে ধ'রে নিলে? ভগবান করুন, আমিই যেন খরচ-চালানোর মত টাকা-পয়সার যোগাড় করতে পারি, তোমাকে দিয়ে অর্থ উপার্জ্জন করাতে না-হয়। তুমি আমায় দুটি ভাত দিয়ো, জল দিয়ো, তাই পাওয়াই হবে আমার যথেষ্ট।"

সাত টাকার মধ্যে সে চার টাকা রমাকে দিয়া নিজে তিন টাকা লইতে গেল, কিন্তু রমা জিদ করিয়া তাহাকে পাঁচ টাকা দিয়া নিজে দুই টাকা রাখিল, বলিল, "আমি থাকব এখানে, সামান্য দু'এক পয়সার বড়-জোর দরকার, কিন্তু তুমি যাবে রাস্তায়, এক-পা চলতে পয়সার দরকার হবে।"

অগত্যা রঞ্জনকে পাঁচ টাকাই লইতে হইল।

সাদেককে ডাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে রঞ্জন বলিল, "রমা তোমারই জিম্মায় রইল সাদেক, আমি কাজের চেষ্টায় কলকাতায় চললেম। দু-চারদিনের মধ্যেই

যে-কোন একটা কাজ ঠিক ক'রে এসে ওকে নিয়ে যাব। ওকে তোমরাই দেখাশোনা ক'রো, তোমাদেরই হাতে ওর ভার দিলেম।"

সাদেক অশ্রুপূর্ণ-চোখে বলিল, "কোন ভয় নেই খোকাবাবু, সাদেক থাকতে বউমার এতটুকু ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাও, কাজের ঠিক ক'রে এসে বউমাকে নিয়ে যেয়ো।"

সে-যে প্রাণ দিয়াও কথা রক্ষা করিবে তাহাতে রঞ্জনের সন্দেহ ছিল না।

একদিন সকালের ট্রেনে রঞ্জন কলিকাতায় রওনা হইয়া গেল।

*

* *

রঞ্জন কাজ খোঁজে, কিন্তু কোথায় কাজ ?

রঞ্জন যেখানে যায় শুনিতে পায়, লোক দরকার নাই। ম্লানমুখে সে ফিরিয়া আসে।

দেশের ছেলে রাখাল, ব্রজেশ্বর প্রভৃতি কয়েকজন মিলিয়া শ্যামবাজারে একখানা খোলার ঘর ভাড়া লইয়াছে, রঞ্জন তাহাদেরই নিকট আশ্রয় লইয়াছিল।

ইহাদেরই চেষ্টায় সে একটা কাজ পাইল। ময়দার কলে কাজ, দৈনিক আট আনা করিয়া মিলিবে।

দৈনিক আট আনা—

রঞ্জন হিসাব করিয়া দেখিল, মাসে পনেরো টাকা।

যে-কোন স্থানে একখানা খোলার ঘর যদি দু-তিন টাকায় ভাড়া

পাওয়া যায়, বাকি টাকায় স্বামী-স্ত্রী দুজনের খুব চলিয়া যাইবে। তা'ছাড়া সে যদি অতিরিক্ত কাজ করে তাহাতেও কিছু আয় হইতে পারিবে।

কলে একদিন কাজ বন্ধ থাকে।

প্রথম দুই-সপ্তাহ সে প্রাণপণে কাজ করিল, তৃতীয়-সপ্তাহের শনিবারে রমার জন্য একখানা শাড়ি, একটা সেমিজ ও একজোড়া শাঁখা কিনিয়া লইল, তাহার পর রওনা হইয়া পড়িল।

একমাস কাজ না-করিয়া সে রমাকে আনিতে পারিবে না এ-কথা রমাকে বলিয়া আসিবে। তাহার হাতে আর গোটা-দুই-তিন টাকা দিয়া আসিবে—যাহাতে সে আর এই কয়টা-দিন চালাইতে পারে। একমাস কাজ করিলে হাতে কিছু জমিবে, তখন ঘর ঠিক করিয়াই রঞ্জন রমাকে লইয়া আসিবে।

রাত্রি প্রায় সাড়ে-আটটায় ট্রেন পৌঁছাইল।

শুক্লা-একাদশীর রাত্রি; রজত-শুভ্র চাঁদের আলোয় চারিদিক প্লাবিত হইয়া গেছে।

রঞ্জন ভয় কাহাকে বলে জানে না, পথে নামিয়া সে হন্-হন্ করিয়া চলিল। মাঘের শেষ, শীত অনেক কমিয়া আসিলেও শীতের জড়তা আছে —হাঁটিতে গেলে সে-জড়তা ঘুচিয়া যায়। মুক্ত মাঠের উপর চাঁদের আলো অবাধে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথায় কোন মুকুলিত আমের কুঞ্জে কোকিল, পাপিয়া ঝঙ্কার তুলিয়াছে, লেবু-ফুলের ও আমের মুকুলের মিষ্ট গন্ধ দক্ষিণা বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে, সে-সব দিকে চোখ দিবার অবসর রঞ্জনের নাই—সে দ্রুত চলিয়াছে।

রমাকে সে একখানা পত্র লিখিয়া জানাইয়াছে—কাজ পাইয়াছে,

দু-চারদিনের মধ্যেই সে বাড়ী আসিবে। রমা স্বপ্নেও ভাবে নাই স্বামী তাহার প্রথমোপার্জ্জিত অর্থে তাহার সেমিজ, শাড়ি, শাঁখা আনিতেছে। এগুলি যখন রমার হাতে পড়িবে?

নিশ্চয়ই সে বলিবে—কেন, এ-সব কিনিয়া আনিবার কি দরকার ছিল।

রঞ্জন বলিবে—তাহার খুসি, সে তাহার রমাকে সাজাইবার জন্য আনিয়াছে।

এ-সব কল্পনা করিতেও রঞ্জনের মন পুলকে ভরিয়া উঠে।

গ্রামে প্রবেশ করিয়া চলিতে-চলিতে রঞ্জন বাধা পাইল।

পথের পাশেই ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের বাড়ী, সেখানে জমিয়াছে গ্রামের সমস্ত লোক, রীতিমত গোলমাল চলিয়াছে।

একজন হাঁকিল—"কে যায়?"

রঞ্জন উত্তর দিল, "আমি রঞ্জন।"

"রঞ্জন—রঞ্জন—"

সকলেরই মুখ হইতে প্রায় একসঙ্গেই রঞ্জনের নাম উচ্চারিত হইল।

ভট্টাচার্য্যমহাশয় আগাইয়া আসিলেন, হাতে একটা লণ্ঠন।

শুভ্র চাঁদের আলোতেও লণ্ঠনটি উঁচু করিয়া রঞ্জনের মুখের উপর আলো ফেলিয়া তিনি গদগদ-স্বরে বলিলেন, "ভগবান আছেন—ভগবান আছেন তাই প্রাণের ডাক ঠিক গিয়ে পৌঁচেছে। এইমাত্রই-না সকলকে বলছিলেম যে, সকালেই কেউ কলকাতায় চ'লে যাক—বেজা, রাখ্‌লাদের ওখানে খোঁজ করলেই রঞ্জুকে পাবে? দেখ, সে নিজেই এসে পড়লো, কাউকে আর যেতে হ'লো না।"

রঞ্জনের যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। এমন কি দরকার যে তাহার কাছে কলিকাতায় লোক পাঠানো দরকার ? রমা—রমা ভালো আছে তো ?"

জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া কণ্ঠ হইতে স্বর ফুটিল না, কেবলমাত্র বলিল, "কি হয়েছে বলুন।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন, "এই তো সবে আসছো বাবাজি! আমার দাওয়ায় ব'সো, একটু জিরো'ও, সব কথা হ'চ্ছে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে রঞ্জন বলিল, "আমার বসবার সময় নেই, আমি বাড়ী যাব। আপনার কি কথা আছে আপনি এই পথেই বলুন।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় লণ্ঠনটা বাঁ-হাতে লইয়া ডান-হাতে কপালে আঘাত করিলেন—"হায় হতভাগ্য! রাস্তায় দাঁড়িয়েও শেষে সে-কথা তোমায় বলতে হ'লো রঞ্জু? আমি আগেই-না তোমায় বলেছিলেম, বউমাকে আমার কাছে রেখে যাও। আমার কথা তো শুনলে না বাবা, হাতে-হাতে এখন তার ফল পেলে তো ?"

রঞ্জন আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, বলিল, "আপনার যা বলবার তা' একটু তাড়াতাড়ি বললেই—"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন, "সেই কথাই তো বলছি বাবা, তিনদিন পরে বউমাকে পাওয়া গেছে আজই বিকেলে।"

"অ্যাঁ!" রঞ্জন যেন আকাশ হইতে ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন, "তবে আর বলছি কি রঞ্জু! তিনদিন আগে সাদেক হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বললে, 'বউমাকে পাওয়া যাচ্ছে না।' শুনে তো আক্কেল গুড়ুম্! গাঁয়ের সব লোক খুঁজতে বার হ'লো;

তিনদিন ধ'রে খুঁজে-খুঁজে সব হায়রাণ, তারপর আজ সন্ধ্যের আগে রায়বাগানের মধ্যে পাওয়া গেল বউমাকে—"

রঞ্জন মন্ত্রমুগ্ধের মত কেবল বলিল, "তারপর ?"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিলেন, "তারপর আর কি—গেছেন সেই সাদেকের বাড়ী। কে আর আছে যে ওঁকে জায়গা দেবে? তবু একটা হেস্তনেস্ত তো করা চাই—আমাদেরই জাত তো বটে! সমাজের বুকে এমন কাণ্ড আমরা কখনও সইতে পারি?"

রঞ্জন আর শুনিতে পারিল না, সে দুই-পা অগ্রসর হইল।

সঙ্গে-সঙ্গে চলিতে-চলিতে ভট্টাচার্য্যমহাশয় চাপা-সুরে বলিলেন, "এসব ওই ওদের কাণ্ড বাবাজি—সব সাদেকের কাজ। আমি তখুনি বলেছিলেম—"

রঞ্জন জোরে-জোরে পা চালাইল, বলিল, "কাজ যাদেরই হোক, তবে সাদেক যে নিরপরাধ এ-বিশ্বাস আমার আছে। তারপরেও যদি আপনার কিছু বলবার থাকে, কাল সকালে এর যা-হয় বিচার করবেন। আজকের মত আসুন, আমাকেও ছেড়ে দিন।"

সাদেকের কুটীর নিস্তব্ধ।

উঠানে দাঁড়াইয়া রঞ্জন ডাকিল, "রমা ?"

উত্তর নাই।

উচ্চকণ্ঠে রঞ্জন আবার ডাকিল, "রমা—রমা ?"

ঘরের দরজা খুলিয়া গেল।

রঞ্জন ডাকিল, "রমা, আমি এসেছি।"

ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল, রমা বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সাদেক আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—"আমি বউমাকে রক্ষা করতে পারি নি খোকাবাবু, বউমাকে—"

রঞ্জন গম্ভীরমুখে বলিল, "কাল শুনব সাদেক, আজ আমি বড় ক্লান্ত।"

সাদেক সরিয়া গেল।

রঞ্জনের সামনে দাঁড়াইয়া—রমা।

রঞ্জন বলিল, "আমি পথে আসতে-আসতে সবই শুনেছি রমা, সঙ্গে-সঙ্গে তার ব্যবস্থাও ঠিক ক'রে ফেলেছি।"

রমা কাঁপিতেছিল, কথা বলিতে পারিল না।

রঞ্জন বলিল, "কাল সকালে গাঁয়ের লোক তোমার বিচার করবার জন্যে এখানে আসবে। ওদের আসবার আগে আমরা গাঁ-ছেড়ে চ'লে যাব, তুমি প্রস্তুত হও।"

ক্ষীণকণ্ঠে রমা বলিল, "কোথায় ?"

রঞ্জন উত্তর দিল, "কলকাতায়।"

"কিন্তু আমি—আমি যে—"

আত্মসম্বরণে অসমর্থা রমা, রঞ্জনের পায়ের তলায় আছাড় খাইয়া পড়িল, "ওগো, আমায় যে সত্যিই গুণ্ডারা ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, আমি যে সত্যিই সব হারিয়ে মরবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেম। তখুনি আত্মহত্যা করতেম, আর আসতেম না, কেবল তোমার সঙ্গে একবার শেষ দেখা করব ব'লেই আবার ফিরে এসেছি।"

রঞ্জন সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে-তুলিতে বলিল, "আমি তা' জানি—আমি নিজের মন দিয়ে তোমার মন জেনেছি রমা, তোমায় আর

কিছু ব'লে জানাতে হবে না। আমি রমাকে চিনি, তাই এই হিংস্র পশুগুলোর সামনে থেকে রমাকে নিয়ে আমি পালাতে চাই। ভয় কি রমা, তোমার স্বামীর স্নেহ-ভালোবাসা তুমি হারাও নি। আমি তোমায় গ্রহণ করেছি, ত্যাগ করি নি। ওঠো, তোমার জিনিসগুলো নাও।"

রমা উঠিয়া বসিল। কোলের উপর রঞ্জনের দেওয়া কাপড়, শাঁখা পড়িয়াছিল, দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া সে কেবল অভাগিনীর মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

*

* *

কলেজে যাইবে বলিয়া অম্বুলা কেবলমাত্র বাহির হইতেছিল, এমন সময় আসিয়া পড়িল—রঞ্জন।

পাঁচ-ছয়বৎসর আগে সে আসিয়াছিল চন্দ্রমোহন থাকিতে। তারপর পাঁচ-ছয়বৎসর সে দূরে সরিয়াছিল, আজ আবার সে সেই বাড়ীরই দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ড্রাইভার মোটরে হর্ণ দিতেছিল। অম্বুলা সেদিকে না-চাহিয়া রঞ্জনের দিকে ফিরিল—

রুক্ষ চেহারা, মনে হয় কাল সারারাত সে ঘুমাই নাই, খায় নাই, যেন কত-বড় একটা ঝড় তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অম্বুলা বিস্মিতভাবে তাকাইয়া রহিল। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আগেই রঞ্জন বলিয়া উঠিল, "আজ বড় বিপদে প'ড়ে তোমারই কাছে

এসেছি অম্লা। তুমি অনেকবার অনেক রকমে সাহায্য করতে এসেছ, তোমার কাছ থেকে এতটুকু সাহায্য নিই নি। নেবনা ব'লেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তোমার সাহায্যের প্রত্যাশীই আমাকে হ'তে হয়েছে। আজ তোমার দয়া ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই অম্লা, আমায় সাহায্য করতে আজ কেউ নেই।"

অম্লা বলিল, "ঘরে এসো, এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না।"

ড্রাইভারকে ডাকিয়া সে বলিল, "গাড়ী গ্যারেজে তোলো, আজ আর কলেজে যাব না।"

রঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া সে উপরে নিজের ঘরে গেল।

একখানা চেয়ার দেখাইয়া বলিল, "ব'সো, কি ব্যাপার হয়েছে শুনি।"

রঞ্জন বসিল না, চেয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আমি তোমার কাছে আশ্রয়প্রার্থী অম্লা। আজ আমাকে আর রমাকে আমার সমাজ স্থান দিলে না; একমাত্র অন্য-সমাজের আশ্রয় বা মরণ-ছাড়া রমার আর আশ্রয় নেই। আমি তাকে আশ্রয় দেব, কিন্তু আমি নিজেই আশ্রয়হীন, দেনার দায়ে ঘর-বাড়ী সবই গিয়েছে।"

অম্লা বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আমি তোমার ভিটে রাখতে চেয়েছিলেম—"

রঞ্জন বলিল, "চেয়েছিলে, কিন্তু আমি নিই নি তার কারণ, তখন ভিটে রক্ষার চেয়ে কারও সাহায্য নেওয়া বেশী ভীতিজনক বোধ হয়েছিল। আজ সেই আমিই তোমার কাছে সাহায্য চাইছি, আশ্রয় চাইছি, নিজের জন্যে নয়—দুর্ভাগিনী রমার জন্যে।"

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দুর্ভাগিনী ধর্ষিতা নারী, সমাজ দণ্ড-বিধান করবে চিরকালের নির্ব্বাসন, আমার সঙ্গে সকল সম্পর্ক তুলে দেওয়া। আমি পারলেম না অমূলা, তাকে ত্যাগ করতে পারলেম না। অথচ তাকে আশ্রয় দেওয়ার স্থান আমার নেই, আমি পরের আশ্রয়ে থেকে দিন আট আনা উপার্জ্জন করি।"

অমূলা উত্তেজিত হইয়া উঠিল, "তুমি দিন আট আনা উপার্জ্জন কর—কোথায়? কোথায় থাক?"

রঞ্জন শুষ্ক-হাসিয়া বলিল, "ময়দার কলে—থাকি বস্তির একটা ঘরে। কিন্তু সে-সব কথা থাক অমূলা, রমাকে আমি নিয়ে এসেছি। চোরের মত গভীর রাত্রে তাকে নিয়ে হেঁটে ষ্টেশনে এসে আজ ভোরের ট্রেন ধ'রে এসেছি। এখন কি করব—তাকে কোথায় নিয়ে যাব? তোমার কাছে স্থান হবে নাকি?"

অমূলা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "রমা এসেছে? কোথায় সে?"

রঞ্জন বলিল, "জানি নে তোমার কাছে আশ্রয় সে পাবে কিনা, তাই তাকে আমি শিয়ালদ-ষ্টেশনে মেয়েদের ঘরে রেখে এসেছি।"

অমূলা বলিল, "আমি যদি আশ্রয় না দিই, তাকে কোথায় নিয়ে যাবে?"

সে-যে এ-প্রশ্ন করিতে পারে তাহা রঞ্জন ভাবে নাই, তাই এ-প্রশ্নে সে মুসড়াইয়া পড়িল; একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "কোথায় যে নিয়ে যাব তা' এখনও জানি নে, তবে নিয়ে যেতে হবে এ-কথা ঠিক। তুমি যদি আশ্রয় না-দাও, ওকে সঙ্গে ক'রে আমায় পথে-পথে বেড়াতে হবে—চিরদিনের জন্য পথই হবে আমার আশ্রয়। ওকে নামাতে

পরাব না অম্বুলা, কারণ সকলের সব আছে, কিন্তু ওর কেউ নেই—কিছু নেই।"

অম্বুলা বলিল, "জানি। তুমি যাও, রমাকে নিয়ে এসো, আমি তাকে আমার কাছে রাখব কথা দিচ্ছি।"

"আঃ, আমায় বাঁচালে অম্বুলা, আমায় তুমি—"

অম্বুলা বলিল, "থাক, আর উচ্ছ্বাসে দরকার নেই, তুমি তাকে আগে নিয়ে এসো।"

ঘণ্টা বাজাইতেই ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল।

অম্বুলা বলিল, "ড্রাইভারকে বল, এখুনি এই বাবুকে নিয়ে শিয়ালদয় যেতে হবে—এখুনি আবার ফিরে আসবে।"

রঞ্জন বলিল, "না-না, মোটর নিয়ে যেতে হবে না, তার কাছে তার অবস্থার তুলনায় এটা মস্ত বড় পরিহাসই হবে অম্বুলা। আমি তাকে রিক্সা ক'রে নিয়ে আসছি।"

সে অগ্রসর হইল।

অম্বুলা সঙ্গে-সঙ্গে চলিতে-চলিতে বলিল, "কিন্তু একটা কথা—তুমিও থাকবে তো—ময়দার কলে কাজ ছেড়ে দেবে তো ?"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া রঞ্জন বলিল, "তাকে তুমি তোমার কাছে রাখতে পারো অম্বুলা, তার পরিচয় কিছু না-দিলেও পারবে, কিন্তু আমার এখানে থাকা যে মুস্কিল হবে।"

তাহার কথা অম্বুলা বুঝিয়াছিল, তবু জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মুস্কিল হবে ?"

রঞ্জন বলিল, "মুস্কিল হবে পরিচয়-দেওয়া নিয়ে। যদি লোকের কাছে

স্বামী ব'লেই পরিচয় দাও, সেটাও বড় সুবিধের হবে না, কেন-না আমি মূর্খ, দরিদ্র—"

অমুলা বলিল, "সে আমি দেখে নেব—তোমাকে সেজন্যে ভাবতে হবে না।"

রঞ্জন চলিয়া গেল।

নূতন বাড়ীতে সেদিন গৃহ-প্রবেশ। নিমন্ত্রিত হইয়াছে সকলেই। মায়া ও নিরুপম কর্ম্মকর্ত্তারূপে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করিতেছিল।

নিমন্ত্রিত হইয়াছে অনেকেই—অনুপম, তাহার স্ত্রী, পুষ্পল এবং অমুলার বন্ধু ও বান্ধবীবর্গ।

অমুলাকে লইয়া আজ পুষ্পলের পরিহাসের শেষ নাই। সে ডাক্তারী পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে কাজ লইয়াছে, জনসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে।

মায়া সকলের কাছে রঞ্জন ও রমার পরিচয় দিয়াছিল।

বেচারা রমা—

লজ্জায় সে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল—অমুলা তাহাকে অবগুণ্ঠন টানিতে দেয় নাই।

একটু আড়ালে অমুলাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া পুষ্পল বলিল, "কিরকম, সইতে পারবে তো?"

হাসিয়া উঠিয়া অমুলা বলিল, "বাংলার মেয়ে সব সইতে পারে পুষ্পল, এ সহ্য-শক্তি তার নতুন নয়। আমার মনে এ-শক্তি আছে, যদি ওদের

এতটুকু কাজে লাগতে পারি—নিজের জীবন ধন্য ব'লে মনে করব। বাবার আশীর্ব্বাদ আমি ভুলি নি পুষ্পল।"

হাতযোড় করিয়া উদ্দেশে সে স্বর্গগত পিতাকে প্রণাম করিল।

পুষ্পল বলিল, "মেয়ের দাবি আর তোমাতে নেই অম্লুলা, এখন তোমায় কি বলা চলে ?"

অম্লুলা ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে-হইতে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, "এখন মেয়ে নই, বোন নই, এখন আমি বাংলার বউ। তোমরা এখন থেকে আমাকে 'বাংলার বউ' ব'লেই ভাববে আশা করি।"

ঘরে ফিরিয়া টেব্‌লের ধারে দাঁড়াইয়া পুষ্পল বলিল, "আজ আমি সকলকে একটা নতুন কথা শোনাচ্ছি। আপনারা সবাই জানুন, আমাদের অম্লুলা যদিও শিশুকালে বিবাহিতা হ'য়ে বাংলার বউ নাম নিয়েছিল, তবু সে-কথা এতদিন সবাই জানতো না, নানা বিপর্য্যয়ে সে-কথা চাপা প'ড়ে গিয়েছিল। এতদিন পরে আজ আমি সগৌরবে আপনাদের সকলের কাছে জানাচ্ছি—অম্লুলা আজ মেয়ে নয়, বোন নয়, তাকে আমরা সকলেই 'বাংলার বউ'-রূপে গ্রহণ করলেম। অতএব আজ থেকে—"

মায়া করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "থ্রি চিয়ার্স ফর্ বাংলার বউ !"

বড়দা পরম আরামে পান চর্ব্বণ করিতে-করিতে বলিল, "বাবা থাকলে আজ সত্যিই বড় খুসি হ'তেন।"

মায়া বলিল, "তাঁর আত্মা স্বর্গ থেকে আশীর্ব্বাদ করছেন। তিনি সর্ব্বদা কল্যাণ-কামনা করছেন ব'লেই এই অঘটন-টা ঘটে গেল, নইলে কেউ-ই তো আশা করি নি যে, অম্লুলা বিলেত-যাত্রা স্থগিত ক'রে সংসার পাতবে।"

বড়দা বলিল, "ঘর-সংসার করুক, তারপর রোজ একবার ক'রে এসে রমার হাতের তরকারি খেয়ে যাওয়া যাবে, কি-বল মায়া? পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা নাকি রাঁধে ভালো।"

রমা অত্যন্ত জড়সড় হইয়া মাথার কাপড়টা চোখের উপর পর্য্যন্ত নামাইয়া দিতে যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি অমূলা তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল, "ফের—আবার?"

রমার সন্ত্রস্তভাবের পানে তাকাইয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

ইতি—

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী